# সম্মতি

– রিজওয়ানা খান

আমাদের সম্পর্কের এক বছরের মধ্যেই আমার ভালোবাসার মানুষটি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ও ছিল প্রচণ্ড রকম লাজুক। ফলে আমি বেশ অবাক হই। দুজনেই সমবয়সী হওয়ায় বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ২০০০–এর ১৩ জানুয়ারি বিয়ে করে ফেলি এক রাতের সিদ্ধান্তে। বিয়ের পর ওকে অনুযোগ করতাম যে, সব কনে বিয়ের দিন শাড়ি পরে অথচ আমি পরেছিলাম সালোয়ার কামিজ। প্রায়ই মার্কেটে গেলে শাড়ি পছন্দ করে ছোটবোনদের দেখিয়ে বলতাম, মনে রাখিস আমার বিয়ের শপিং তো তোরাই করবি। ও শুনে মুচকি হাসতো, কিছু বলতো না। এমনকি দেখা করার সময় শাড়ি পরার পারমিশনও দিতো না, শাড়ি পরে রিকশায় উঠতে গেলে নাকি পা দেখা যাবে।

আত্মীয়স্বজনদের চোখে পড়ার ভয়ে প্রায়ই আমরা ওর কোনো বন্ধুর বাসায় সময় কাটাতাম অথবা ওর ফুপ্পি ঈদে বা অন্য কোনো ছুটিতে গ্রামে গেলে ওনার বাসায় বসতাম। কিন্তু ও কখনোই আমার প্রতি অন্য রকম আগ্রহ প্রকাশ করতো না, রাস্তা পারাপারের সময় ছাড়া পারতপক্ষে আমার হাতও ধরতো না। এমনো ঘটনা ঘটেছে যে, দুজনের গন্তব্য একই। অথচ ও আমাকে বলতো, তুমি রিকশা করে চলে যাও, আমি আসছি। আবার হয়তো বা ওর বন্ধু বা ফুপ্পির বাসায় বসে আছি, আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে ও আমাকে একটু স্পর্শ করুক, জড়িয়ে ধরুক। কিন্তু ও তখন নিবিষ্ট চিত্তে খাটের আরেক কোণায় বসে আমাকে কমপিউটারের ফাংশন বোঝাচ্ছে। প্লেটোনিক লাভ! মনে মনে বলতাম, নিকুচি করি প্লেটোনিক লাভ–এর। আমার এসব কাহিনী শুনে বান্ধবীরা খুব একচোট হাসতো আর পরবর্তী কালে ওদের রোমান্টিক কাহিনীগুলো আরো ইনিয়ে–বিনিয়ে আমাকে শোনাতো। এবং শাকিলকে আমি ডাকতাম রোবট বলে।

কিছুদিন পর ঈদের বন্ধে ওর ফুপ্পি বাসার চাবি ওকে দিয়ে গ্রামে গেলেন। আমরা ঠিক করলাম কিছুক্ষণ ওয়াটার ফ্রন্ট–এ কাটিয়ে ওর ফুপ্পির বাসায় যাবো। পরদিন ওকে না জানিয়ে শাড়ি পরলাম। ও আমাকে দেখে মুগ্ধ চোখে বললো, সুন্দর লাগছে।

প্রথমে আমরা বেবিট্যাকসি করে ওয়াটারফ্রন্টে গেলাম। ওখানে অনেকক্ষণ বসলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ফুপ্পির বাসায় যাবো না। ফেরার পথে ও আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, আমার পেছনে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। হঠাৎই ও আমার বুকে হাত দিল, প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে চাপ দিল। তখন ও রীতিমতো ঘামছিল। এরই মধ্যে মতিঝিল চলে এলাম। আমাকে নামিয়ে দিল ও। রাতে ফোন করে বললো, পরদিনও আমি যেন শাড়ি পরেই যাই। আমাকে শাড়িতে খুব সুন্দর লাগছিল বলেই নাকি ও কনট্রোল করতে পারেনি, আর যা কি না বিয়ের তিন মাস পরও কোনো একাকি বাসায় হয়নি তা আজ হলো চলন্ত পথে, তাও শাড়ির কারণে। ও আশংকা প্রকাশ করলো বাসায় হলে না জানি আজ কি হতো। আমি মনে মনে বেশ পুলকিত ছিলাম। এতোদিন ওর অনাগ্রহ দেখে ভীষণ কষ্ট হতো। মনে হতো আমি কি অচ্ছুত? অথচ আজ স্বপ্ন আমার কতো কাছে।

পরদিন কলাপাতা জমিনে কালো, বাদামি কাজ করা আচলের একই শাড়ি পরে সরাসরি ফুপ্পির বাসায় গেলাম। ও আমাকে ঢুকিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর আমাকে প্রচণ্ড শক্ত করে জড়িয়ে

ধরে রাখলো অনেকক্ষণ। তখন মনে হচ্ছিল এতো ভালোবাসা থেকে এতোদিন বঞ্চিত ছিলাম। তারপর ও আমাকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রথমে অনেকক্ষণ আমাকে দেখলো। কেমন ঘোরলাগা দৃষ্টি, আগে কখনো দেখিনি। তারপর আমার ঠোটে আলতো করে চুমু দিল। এরপরই কেমন যেন অস্থির হয়ে গেল। পাগলের মতো আদর করতে লাগলো, নিজ হাতে আমার শাড়ি খুলে দিল।

বললো, এখন থেকে তুমি প্রতিদিন শাড়ি পরবে। ঠিক আছে?

আমি সম্মতি দিলাম। তারপর ধীর ধীরে ডুবে যেতে লাগলাম এক রহস্যময় ভালোবাসার জগতে এবং ভাবছিলাম আজ স্ত্রী হিসেবে আমি সার্থক, নতুন করে আজ আর কিছু চাইবার নেই। আজ যে আমার স্বপ্ন পূরণের দিন। জয়তু শাড়ি।

*ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# আশীর্বাদ

– সাইফুল ইসলাম

সমস্ত ঘরে হই চই, কি ব্যাপার? কলেজ থেকে ফিরে ঘরের এই অবস্থা দেখে হার্টবিট বেড়ে গেল। আপুর বিয়ের একদিন আগের ঘটনা। বাসার দোতলায় একটা রুম বন্ধ। আব্বু আম্মুর চেচামেচিতে দৌড়ে এসে দেখি দোতলায় আপুর রুমের সামনে দরজা খোলার প্রাণান্তর চেষ্টা। আম্মু বলে যাচ্ছেন জিয়া মারা গেছে, তোর কি হয়েছে? জিয়া তোর কি লাগে? যার জন্য তুই খাওয়া–দাওয়া বন্ধ করে, রুম লক করে বসে আছিস। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন তা কলেজ থেকে শুনে এসেছিলাম। আমি সহ আমার সহপাঠী সবাই দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু জিয়াকে আমার বোন এতো ভালোবাসতো যে তা বলাই বাহুল্য। তার রুমে জিয়ার বিশাল একটা ছবি টাঙিয়ে রাখা আছে। ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় নির্বাচনে বিভিন্ন দলের লোকেরা খাওয়া–দাওয়ার আয়োজন করতো। কিন্তু আমার এই অতি আদরের একমাত্র বড়বোন নাকি জীবনেও সেই রকমের কোনো পার্টিতে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, তাদের দেয়া কোনো খাবারের জিনিস পর্যন্ত খেতেন না। বলতেন, যাকে ভোট দেবো না তা জিনিস খাবো কেন? এমনই একরোখা আমার বোন আজ তার প্রিয় ব্যক্তিটিকে হারিয়ে প্রায় পাগলের মতো। কিন্তু আম্মার মন খারাপের আরো একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে আপু আজ যে শাড়িটি পরে আছে সেটি তার বিয়ের শাড়ি। আপুর বিয়ে আগামীকাল। সুতরাং আগে আগেই বিয়ের শাড়িটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কেননা এ একই শাড়ি পরে আম্মুর বিয়ে হয়েছিল। এবং আম্মু–আব্বুর মধ্যে ভালোবাসা ছিল অনেক যা এখনো আছে। যাই হোক। শাড়িটি এতো সুন্দর ছিল যে, আপু সেই শাড়ি পরে বিয়ের পিড়িতে বসতে চায়।

আম্মুর কথা অনুযায়ী আপুর বিয়ের পর এ একই শাড়ি দিয়ে আমার বৌকেও ঘরে তোলা হবে এবং এই শাড়ি হচ্ছে আমাদের পরিবারের শুভ ভাগ্যের নির্ধারক। যেই পরবে সেই সুখী হবে যেমনটি আম্মু–আব্বু হয়েছেন।

যাই হোক। অনেক বোঝানোর পর বোনকে বের করে আনা হলো পরের দিন বিয়ে। সুতরাং আজকে রাতে কথা বলতে হবে ছন্দার সঙ্গে। আপুর বিয়েতে ছন্দা কি কাপড় পরবে আর আমি কি পরবো।

ছন্দা হচ্ছে আমাদের ঠিক পাশের বাসার নামকরা এক বিজনেসম্যান আজিজ সাহেবের একমাত্র মেয়ে। যেমন সুন্দরী তেমনি জ্ঞানী–গুণী। কথা যেন মাটিতে পড়ে না। ছন্দার সঙ্গে দেখা হলেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে নামাজ পড়েছি কি না। মুখের কাছে মুখ এনে গন্ধ শুকে দেখবে সিগারেটের গন্ধ আছে কি না ইত্যাদি। আমাদের দুইজনের বাসা দোতলা হওয়ার সুবাদে রাতের বেলা দেখা হতো। আমাদের ছাদের রেলিং ও ছন্দাদের ছাদের রেলিংয়ের দূরত্ব দুই ফিট হওয়াতে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হতো না। প্রত্যেক দিন রাত আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত ছিল আমাদের ডেটিং করার সময়। আজ ছন্দার জন্য টুকটাক কিছু জিনিস কিনেছি যেমন খয়েরি রঙ–এর চুড়ি, খয়েরি লিপস্টিক। ছন্দা তখন ক্লাস নাইনে পড়তো এবং আমি সবে মাত্র এসএসসি পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি বয়সের তুলনায় ওর বুক জোড়া একটু বেশি ভারী মনে হতো। এর উত্তরে ছন্দার সোজা উত্তর আমার ধস্তাধস্তিতেই নাকি এমন অবস্থা। আমারও সোজা উত্তর কি করবো। ভালো লাগে যে তাছাড়া ছন্দার ঠোট যেন ঠিক একটা কমলা লেবুর টুকরো, মুখের ভেতর নিলে আর কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ছন্দার গায়ের রঙ এতো ফর্শা ছিল যে ওর গলার শিরা–উপশিরা কয়টা তা প্রায়ই গুণতে চাইতাম, গুণতে চাইতাম, গুণে বলতাম, জামাটা একটু খোলো, বুকের কাছে তো গুণতে পারছি না।

একদিন শাড়ির কথা বলাতে ও বলে বসলো, যে শাড়ি আমাদের বিয়েতে পরতে হবে সেটা একটু আগে ভাগে পরে দেখলে হতো না। ইতিমধ্যে বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ওই শাড়ি আম্মু তার আলমারিতে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। তাই ঠিক করা হলো আগামীকাল ওর জন্মদিন উপলক্ষে রাত আটটায় ওই শাড়ি নিয়ে আসবো এবং ওই শাড়ি আমার সামনেই ওকে পরতে হবে। পরের দিন ঠিক আটটা বাজার দশ মিনিট আগে আমি ছাদে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে, একটা বিজলী খেলে গেল এবং বিকট একটা বাজের শব্দ হলো। বুঝতে পারলাম যে আকাশের অবস্থা ভালো না। ও ঠিকই এলো পরনে হলুদ–লাল স্কার্ট ও শাদা শার্ট গায়ে দিয়ে। আমাকে খুজতে লাগলো ঠিক তখনই ওকে পেছন দিক থেকে জাপটে ধরে ওর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে লাগলাম। আমি শাড়ি এনেছি কি না? উত্তরে হ্যা বোধক শব্দ শুনে আমাকে আবার জাপটে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। তারপর পটু মেয়েদের মতো শাড়ি পরা আরম্ভ করলো। যেহেতু কথা ছিল আমার সামনেই পরতে হবে তাই আস্তে করে ওর স্কার্ট খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর ওর উরুস্থল সন্ধি হতে আলোকচ্ছটা বের হতে লাগলো। ও লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রেখেছে। আমিও অদক্ষ মানুষের মতো শাড়ি পরাতে আরম্ভ করলাম নিচেরটা জড়িয়ে দিয়ে এবার শার্ট খোলার পালা। ছন্দাই বললো আমাকে খুলে দিতে। আমি পটাপট খুলে দিতেই ওর বিশাল বুক জোড়া বেরিয়ে এলো ঠিক থাকতে পারলাম না আমার ঠোটের পরশ দিতে থাকলাম। ও ঠিক বৌয়ের মতো আমাকে সালাম করে উঠে দাড়াতেই আরেকটা বাজ পড়লো। ছন্দা ভয়ে আমার বুকের ভেতর মুখ লুকালো। মুহূর্তেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি সিড়িকোঠায় যাবার জন্য উদ্যত হতেই ছন্দা এখানেই দাড়াতে বললো এবং আমার বুকের সঙ্গে মিশে যেতে চাইলো। আমি বলতে লাগলাম যে বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার অসুখ করতে পারে, তাছাড়া এই শাড়িটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছন্দা শুনলো না। ও আমাকে বসতে বললো। তারপর আরম্ভ হলো সত্যিকারের বর–কনের খেলা। আমার মুখের দুপাশে ওর স্তন জোড়া দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দিল। আমিও ছন্দাকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের প্রথম বার সুখের সাগরে ভাসলাম।

এখন এই ছন্দা আমার জীবনসঙ্গিনী। আমরা অনেক সুখী। মাঝে মধ্যে একটু মনোমালিন্য হলে ছন্দা সেই শাড়ি পরে এসে আমার পাশে বসে। মুহূর্তেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। মুহূর্তেই প্রেম এসে যায়। মুহূর্তেই ছন্দাকে জড়িয়ে ধরি এবং বলতে থাকি, ছন্দা, এমনি করেই আমাকে ভালোবেসো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

*জুবাইল, সউদি আরব থেকে*

## মাকড়সা

– মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম প্রিন্স

নীল রঙ আমার সব সময়ই পছন্দ। বিশেষ করে কিছু উপহার দেয়া মানেই প্রথমে নীল রঙকে বেছে নেই। ১৯৯৯ সালের ঘটনা। আমার বোনের বিয়ে। বিয়েতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, বিয়ের পরের দিন গ্রামের রেওয়াজ অনুযায়ী আমাদের বাড়িতে লোকজন এলো, সেই সঙ্গে এলেন সাত আটজন তরুণীসহ কয়েকজন ভাবী। এদের মধ্যে একজন ভাবীর ছিল নজরকাড়া চেহারা, নাদুস-নুদুস বডি, লম্বা, গায়ের রঙ দুধে-আলতা, স্তন দুটি সুডৌল। দেহের প্রতিটি ভাজে ভাজে সেক্স। সেই ভাবীর পরনে গাঢ় নীল রঙ-এর পাতলা ফিনফিনে শাড়ি। মানানসই ব্লাউজসহ যাবতীয় অলংকার সব মিলিয়ে যেন অপূর্ব পরী। যাই হোক। ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু নাটকীয়।

বাড়িতে গোলমাল, লোকজনের ভিড়, একটু পরেই দুপুরের খাবার খেতে হবে। এই ফাকে একটি পড়ার ঘরে বাংলায় যাকে বলে আনমনা ভঙিতে খাটে হেলান দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ-এর *নীল অপরাজিতা* বইটি পড়ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই নজরকাড়া ভাবীটি আমার রুমে প্রবেশ করলেন এবং তারপরই ঘটলো নাটকীয় ঘটনা।

ঘরে প্রবেশ করা মাত্র এক মাকড়সা ভাবীর শরীরের ওপর পড়লো। মুহূর্তে বিদ্যুৎ বেগে শাড়িটি মেঝেতে সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে চিৎকার দিয়ে আমার ওপর পড়লেন। শুধু পরনে পেটিকোট আর ব্লাউজ। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড এভাবে রইলেন। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বুঝতেই পারলাম না ব্যাপারটা কি? শুধু বললেন, মাকড়সা।

যাহোক, প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড আমার ওপর থাকার পর শরীর আমার শিহরিত। তারপর ফেলে দেয়া নীল শাড়িটি কুড়িয়ে আনি। তখনো ভাবী প্রায় অর্ধনগ্ন। দারুণ লাগছিল ভাবীকে। বাড়ি ভর্তি লোকজন ছিল। ভাগ্যিস কেউ দেখেনি ঘটনা। যখন নীল শাড়িটি ভাবীকে দুই হাতে এগিয়ে দিলাম তখন ভাবী আমার দিকে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। স্থির থাকতে পারলাম না। আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে দুই ঠোটে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলাম।

সমস্ত ঘটনাটি দশ মিনিটের ভেতর ঘটলো।

*ভাকুর্তা, সাভার, ঢাকা থেকে*

# অদ্ভুত

– নিলুফার সুলতানা

শাড়ি নিয়ে লিখতে বসে অদ্ভুত এক স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দেয়। বিয়ের পর ঈদের শাড়ি কিনতে স্বামীর সঙ্গে গুলিস্তান এলাকায় একটি কাপড়ের দোকানে গিয়ে খুব সুন্দর একটা নীল রঙের শাড়ি, পেটা জরির কাজ পাড় দেখে কিনলাম। সবাই বললো খুব সুন্দর। ঈদের দিন পরে খালার বাসায় বেড়াতে গেলাম। সবাই শাড়ি ও আমার সৌন্দর্যের প্রশংসায় মুখর হলো। কিছুক্ষণ পর খুব অসুস্থ লাগলো। গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর কয়েকদিন পর হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে গেল। কি কষ্ট যে পেয়েছিলাম।

কিছুটা সুস্থ হলে স্বামীর কর্মস্থল পাকিস্তান টোবাকো কোং চট্টগ্রামে সংসার করতে গেলাম। থাকতাম চট্টগ্রামের সারসন রোডে উচু পাহাড়ের ওপর সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে। চারদিকে এ জায়গাটা অপূর্ব। এমনিতে চট্টগ্রামের প্রায় জায়গাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা। কাছে পাহাড় থাকলে তো কথাই নেই। তখন টোবাকো কোংয়ে বাঙালি প্রায় ছিলই না। হাতে গোনা দুই একজন মাত্র। বিভিন্ন দেশের লোক কাজ করতো। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ছিল বৃটিশ। নাম পিটার। সিনেমার নায়কদের মতো সুন্দর তাও আবার ব্যাচেলর। আমাদের সঙ্গে তার ছিল খুব বন্ধুত্ব। লন্ডন থেকে পিটারের গার্লফ্রেন্ড সুজান এলো এবং চট্টগ্রাম তার খুব পছন্দ হলো। খুব ঘোরাঘুরি করলাম আমরা, প্রচুর বেড়ালাম। প্রায়ই কাপ্তাই লেকে যেতাম লঞ্চে ঘোরার জন্য।

একদিন সুজান বললো, বৃটিশ হাই কমিশনারের অনারে এখানে পার্টি হবে, শাড়ি পরে সবাইকে সারপ্রাইজ দেবো। আমার তিনটা দামি–শাড়ি এনে দিলাম, সে বেছে ওই নীল শাড়িটাই নিল। বললো, পরিয়ে দাও। আমার ব্লাউজ ইত্যাদি দিয়ে সেফটিপিন গুজে–টুজে মোটামুটি শাড়িটা পরিয়ে দিলাম। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার উচ্ছ্বাস দেখে আমরাও খুশি হলাম। বিরাট গাড়ি করে পিটারের সঙ্গে পার্টিতে চলে গেল। দুদিন পর এসে শাড়িটা ফেরতে দিল। ওর দেশে ফেরার কথা, তাই পরদিন আমরা তাকে সি–অফ শেষে প্লেনে তুলে দিলাম। পিটার বললো আগামী মাসে লন্ডন যাবে সুজানকে বিয়ে করতে।

মাত্র চার পাচ দিন পর পিটার উদভ্রান্ত ও পাগল মতো অবস্থায় এসে আমাদের ড্রয়িংরুমে আছড়ে পড়লো। বললো সুজান আর নেই। দেশে পৌছানোর মাত্র পাচ দিন পর ফুড পয়জনিং হয়ে মারা গিয়েছে। বয়স হয়েছিল মাত্র পচিশ। কি সান্ত্বনা দেবো তাকে!

লেখাটা এখানে শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু হলো না। শাড়ির কেরামতি এখনো শেষ হয়নি।

এই ঘটনার বছর খানেক পর আমার প্রিয় বান্ধবী খুব ভালো গায়িকা ছিল। সেই হলিক্রস কলেজ থেকে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। দীর্ঘ জীবন চট্টগ্রামে কাটিয়েছি। একদিন ও বললো, বর্ষ বরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে, একটা নীল শাড়ি লাগবে।

আমার সব কয়টা নীল শাড়ি দিলাম। বান্ধবী ওই ঘন নীল শাড়িটাই পছন্দ করে নিয়ে গেল। অনুষ্ঠানের পর যথারীতি ফেরত দিয়ে গেল। কিন্তু রাতে খবর পেলাম পার্টি থেকে ফিরে ওর স্বামীর আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয়ে বাথরুমে পড়ে মারা গেছে।

এবার আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হলো এ শাড়িটা যেই পরলো তারই চরম বিপদ ঘনিয়ে এলো। তাই ওটা আর কখনো পরবো না। বা কাউকে দেবো না বলে স্থির করলাম এবং বাক্সের সবচেয়ে নিচে রেখে দিলাম। এরপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর সকলেরই বিপর্যস্ত জীবন নতুন করে গোছানোর শুরু হলো। কিন্তু ঘর গোছাতে গিয়ে দেখলাম সবই আছে। নেই শুধু ওই বাক্সের নিচে রাখা অভিশপ্ত শাড়িটা। কোথায় গেল, কে নিল স্মরণই করতে পারলাম না, হয়তো সব ঘটনাই কাকতালীয়। তবু উধাও হয়ে যাওয়া জড় পদার্থটি অনেক দিন ভাবিয়েছে আমাকে।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

## ছেড়া

– শামসুন্নাহার

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে লন্ডন শহরের সাউথ কেনসিংটন টিউব স্টেশন থেকে দক্ষিণ লন্ডনে যাওয়ার জন্য পাতাল রেলে চেপে বসলাম। খবর পেয়েছি সেখানে এক দোকানে খাটি সিল্ক ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ি পঞ্চাশ পারসেন্ট কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ মাত্র পনেরো পাউন্ডে। সরকারি মেধাবৃত্তির পরিমাণ যেখানে মাসে মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ড ছিল, সেখানে পনেরো পাউন্ডে একটা শাড়ি কিনতে চাওয়াটা বিলাসিতা। তবুও লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফেরার আগে এই বিলাসিতাটুকু না করে পারলাম না। খাটি সিল্কের ফ্রেঞ্চ শিফন একটা শাড়ির আমার অনেক দিনের শখ। যাই হোক। দোকানে গেলাম, শাড়ি কিনলাম, দেশেও ফিরলাম। শখের শাড়িতে নিজের পছন্দমতো সুতা ও পুতির কাজ করিয়ে নিলাম, এক কথায় অপূর্ব।

সহসাই শাড়িটি পরার উপযোগী অনুষ্ঠান এসে গেল। এক বড়লোক আত্মীয়ের বাসায় নিমন্ত্রণ। আরেক আত্মীয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম সেই পার্টিতে। খাবার পর্ব শেষে কোল্ড ড্রিংকসের গ্লাস হাতে ভিড়ের চাপ এড়াতে আত্মীয়াকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় গেলাম খোলা জায়গায় বসার জন্য। সৌজন্য দেখাতে গিয়ে ভালো চেয়ারটি আত্মীয়াকে ছেড়ে দিয়ে নিজে খালি পেলাম যে বেতের চেয়ারটি। সেটির বসার জায়গাটা কিছুটা ভাঙা এবং গদিবিহীন। কি আর করা! বসে পড়লাম।

একটু পরে ওঠার সময় বিপত্তিটা ঘটলো। অতি মোলায়েম সিল্ক শিফন শাড়ি খচ করে ছিড়ে গেল। আমার মনে হলো, বুকের ভেতরের কিছু শিরা–উপশিরা ছিড়ে গেল। বাসায় ফিরতেই সকলে বকাবকি শুরু করলো। এতো কোমল মসৃণ একটা শাড়ি পরে ভাঙা বেতের চেয়ারে বসার কি দরকার ছিল। তাও ভালো চেয়ারটা অন্যকে ছেড়ে দিয়ে, ইত্যাদি।

শাড়িটা আজো আছে যত্নে। খুব যত্ন করে সূক্ষ্মভাবে ছেড়া জায়গাটা রিপু করে শাড়িটা কয়েকটা অনুষ্ঠানে পরেছি বিগত বছরগুলোতে। প্রতিবারই বুকের ভেতর খচ খচ করেছে একটা কষ্ট।

*রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে*

# অপূর্ব

– হোমায়রা

আজ পহেলা বৈশাখ। আমার পরনে লাল পাড়, শাদা শাড়ি। কপালে আগুন লাল টিপ। জয়নাল আবেদীন পার্কে গিয়ে দেখি আমি একা নই, এ রকম শাড়িতে আরো অনেকে। সেই শাড়ির কথাই লিখছি। এবারে পহেলা বৈশাখ আমাদের অর্থাৎ আমার ও আমার বান্ধবীদের কাছে একটু অন্য রকম ছিল। পড়াশোনার চাপ ছিল না, বাড়তি কোনো ঝামেলাও ছিল না। প্রত্যেকেরই জীবনের সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি হয়ে গেছে। তাই বান্ধবীরা মিলে ঠিক করলাম শাড়ি পরবো। কিন্তু শাদা জমিনের লাল পাড়ের শাড়ি। এটা ঠিক করা ছিল না। সিদ্ধান্ত ছিল সবাই মানানসই যে কোনো একটা রঙ–এর শাড়ি পরবো।

ব্যাপারটা যেহেতু আমার কাছে খুব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা তাই স্বভাবতই বিষয়টি আমার প্রিয় বন্ধুকে বললাম। এর কয়েকদিন পর আমার বন্ধুর কাছ থেকে বেড়াতে যাবার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। আর তখন কি জানতাম আমার জন্য এমন একটা ঘটনার সৃষ্টি হবে। তারিখটা ঠিক মনে নেই। ঘুরে ফিরে যখন বাসায় চলে আসবো তখন বললাম এক বান্ধবীর বাসায় নামিয়ে দিয়ে যেতে। আমি পরে বাসায় যাবো।

সে ঠিক তাই করলো। বান্ধবীর বাসার সামনে রিকশা থামতেই আমাকে বললো, যতোক্ষণ সে আমাকে নামতে না বলবে আমি যেন ততোক্ষণ রিকশায় বসে থাকি।

আমিও বোকার মতো তাই করলাম। আর উনি! আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে আমাকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চম্পট। সঙ্গে জুড়ে দিল একটা উপদেশ, বেশি দেরি করো না।

প্যাকেট খুলে তো অবাক। শাড়ি, শাদা জমিন লাল পাড়। ব্যাপারটা বান্ধবীদের বলতেই তারাও রাজি হয়ে গেল শাদা শাড়ি পরার জন্য। আমি আজ সেই শাড়ি পরেই বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়েছি। খুব মজা হয়েছে। জানি না সামনের পহেলা বৈশাখে কি সব বন্ধুদের কাছে পাবো?

সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর পর যখন বাসায় ফিরলাম প্রথমেই দাড়ালাম আয়নার সামনে। নিজেকে কি অপূর্ব লাগছে! নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না। আর বার বার মনে হচ্ছে, আমার অপূর্বতার রহস্য অন্য কিছু নয়, শুধুই শাড়িটার জন্য।

*পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ময়মনসিংহ থেকে*

# কসম

– ইয়াছিন আরাফাত টিপু

একাকী ঘুমিয়ে আছি রুমে। বেশ গরম পড়ছে। মাথার উপরে সিলিং ফ্যানটি ঘুরছে তার আপন গতিতে। হঠাৎ করে মনে হলো কানের মধ্যে পোকা ঢুকেছে। আড়মোড়া ভেঙে কানের মধ্যে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে চুলকালাম। একটু পরেই ঘুমের মাঝে আবারও টের পেলাম অন্য কানেও হয়তো পোকা ঢুকেছে। কানের মাঝে আঙুল দিয়ে চুলকানোর উদ্দেশে যখন কানে আঙুল দিতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই আমার হাতটি কে যেন ধরে ফেললো। থতমত খেয়ে বেডের ওপর উঠে বসলাম।

দেখি পাশের বাড়ির সুমি। সম্পর্কে সে আমার চাচাতো বোন। এই গরমের দুপুরে তার উপস্থিতি আমার কাছে মোটেও স্বস্তিকর লাগছিল না।

আমি কিছু বলার আগেই সে বললো, এতো ঘুমুচ্ছেন কেন?

উত্তরে বললাম, রাতে ভালো ঘুম হয়নি এ জন্য।

সে ভেংচি কেটে বললো, রাতে ঘুম হয়নি কেন? সারা রাত কি করেছেন? নাকি অন্য কোনো ব্যাপার?

সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলাম, রাতে উপন্যাস লিখছিলাম। তাই বেশি ঘুমুতে পারিনি।

সুমি তিক্ত কণ্ঠে বললো, মেয়েদের মন বোঝার ক্ষমতা নেই যার, সে আবার উপন্যাস লেখে! তাও আবার রোমান্টিক উপন্যাস। জানেন উপন্যাস লিখতে হলে কি করতে হয়?

মাথা ঝাকিয়ে উত্তর দিলাম, না।

এবার একটু কড়া কণ্ঠে সুমি বললো, তা কি করে জানবেন, একেবারে যে কচি খোকা আপনি। জানেন রোমান্টিক উপন্যাস লিখতে গেলে অন্তত একশ মেয়ের সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হয়। একটা মেয়ের মনের কথা যে জানে না কিছু সে আবার হয়েছে ঔপন্যাসিক।

এতোক্ষণ তার কথা শুনছিলাম চুপ করে। এবার একটু ধমকের সুরে বললাম, তোর বকবকানি থামা। বল কি জন্য এসেছিস। আর এ দুপুরে আমার ঘুমই বা ভাঙালি কেন?

আমার খুশি হয়েছে আমি ভাঙিয়েছি। যদি কোনো অন্যায় করি তাহলে শাস্তি দিতে পারেন। দিনের বেলায় বেশি ঘুমুতে নেই। তাহলে শরীর খারাপ করে। স্বাস্থ্যের তো যত্ন নিতে জানেন না, জানেন শুধু লেখালেখি করতে।

আমি জানি না এ মেয়েটি কেন আমার ওপর এতো অধিকার ফলায়। আমি তো তার ওপর কোনো অধিকার দেখাইনি। তবুও সে নানান কারণে আমার ওপর আধিকার দেখায়। এবার সিরিয়াসলি বললাম, কি কারণে এসেছিস তাই বল।

সুমি বললো, আসমাভাবী আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কি কারণে?

আমি কিভাবে জানবো। হয়তো আছে আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো কারণ। আমি হাত দিয়ে সুমিকে মারতে যাবো এমন সময় আমাকে *অকর্মা কোথাকার* বলে রুম থেকে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সুমি আমাকে অকর্মা বলে। কি জন্য বলে তাও জানি না। শুধু সুমি নয়, আমার অনেক বান্ধবীরা আমাকে ম্যাডাম, কেউ *সিস্টার* বলেও ডাকে। অনেক মেয়ে আমাকে বলেছে, *হাতে চুড়ি পরে থাকেন,* কেউ বা আবার বলেছে *কানে দুল পরেন, শাড়ি পরেন* ইত্যাদি। দুঃখের কথা, আমার ছোট বোনের এক বান্ধবী এসেছিল আমাদের বাড়িতে। সেও চলে যাবার সময় আমাকে অপদার্থ বলেছিল। বিভিন্ন নামে আমাকে ভূষিত করার একটাই কারণ। হয়তো আবিষ্কার করতে পেরেছে যে, আমি খুব লাজুক। মেয়েদের সঙ্গে লজ্জায় কথা বলতে পারি না। এমনকি বাড়িতে কোনো মেয়ে আত্মীয় এলে লজ্জায় বাড়ি ছেড়ে পালাতাম এবং তারা না যাওয়া পর্যন্ত বাড়িতে ফিরতাম না। বন্ধুদের কাছে এসব বললে তারা ধিক্কার জানিয়ে বলতো, তোর মতো এমন আকর্ষণীয় চেহারা থাকলে আমরা দেখে নিতাম। যাক সে সব কথা। ঘুম থেকে উঠলাম বেলা পাচটায়। নামাজ সেরে ভাবীদের বাড়িতে

গেলাম। দেখলাম ভাবী ঘরের কোণে মোড়া পেতে বসে আছেন। চোখ দেখেই বুঝলাম আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। সদ্য বিবাহিতা আসমাভাবী আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, বসো।
আমি মোড়ায় বসলাম।
ভাবী ঘরে গেলেন এবং ফিরে এসে আমার হাতে পাচশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, তুমি তো প্রতিদিন যশোর এমএম কলেজে যাও। সেখান থেকে ফিরে আসার পথে আমার জন্য ভালো একটা শাড়ি কিনে নিয়ে এসো। ওঠার জন্য পা বাড়াতেই ভাবী আমার হাত টেনে হ্যান্ডশেক করলেন এবং বললেন, জানো, আমি সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখেছি।
জানতে চাইলাম কি স্বপ্ন।
ভাবী বললেন, থাক, কাল বলবো।
আমার পছন্দের তারিফ প্রায় সবাই করে। নিজের কাপড়সহ অন্যান্য জিনিস নিজেই কিনতাম এবং ফ্যামিলির অন্যদের কাপড় চোপড়ও আমি কিনতাম। খুব ভালো না হলেও মোটামুটি মানসম্মত হতো।
যাহোক, পরের দিন কলেজ থেকে ফেরার পথে পাচশ চল্লিশ টাকা দিয়ে সুন্দর একটি টাঙ্গাইল শাড়ি কিনলাম এবং বাড়িতে পৌছে বিশ্রাম নিলাম। ভাবীকে খবর পাঠালাম শাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু ভাবী এলেন না। বাধ্য হয়ে গেলাম ভাবীদের বাড়ি। দেখি ভাবীদের ঘরে সুমি। ভাবীর কথা বলতেই বললো, আপনি বসুন, আমি ডেকে নিয়ে আসি।
ভাবীর রুমে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই ভাবী একা ফিরে এলেন, সুমি এলো না। আমাকে দেখেই ভাবী একরাশ হেসে বললেন, এসেছো তুমি?
হাত বাড়িয়ে শাড়িটা দিলাম ভাবীর হাতে।
শাড়ি নেয়ার সময় ভাবীর দুই হাতটি ছুয়ে দিল আমার হাতটি। ভাবী দেখতে ভালোই সুন্দরী। কিন্তু আজকে আরো বেশি সুন্দর মনে হচ্ছিল। আমি ওঠার জন্য পা বাড়ালাম।
ভাবী বাধা দিয়ে বললেন, একটু বসো, তুমি শাড়ি কিনে আনলে, আমি পরি তুমি দেখে যাও।
উত্তরে জানালাম, আজ না, অন্য এক সময় দেখবো।
ভাবী আরো বেশি বাধা দিয়ে বললেন, প্লিজ, আর একটু বসো। ও ভালো কথা, তোমাকে তো সেই স্বপ্নের কথা বলা হয়নি।
ভাবীর স্বপ্নের কথা শোনার জন্য বসলাম।
ভাবী দরজা ভেজিয়ে দিলেন। খুব সহজেই তার পরনের শাড়িটি খুলে ফেললেন আমার সামনে। নতুন শাড়িটি তখনো পরা হয়নি। তখন ভাবী আমাকে বললেন, দেখো, আমাকে কেমন লাগছে।
ভাবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি মোহময়ীভাবে দাড়িয়ে আছেন। বের হতে চাইলাম ঘর থেকে।
ভাবী এবার দরজার সামনে গিয়ে দাড়ালেন।
বের হতে পারলাম না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ভাবী কি করছে! আমার সমস্ত লজিক তখন উল্টে–পাল্টে যাচ্ছে। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাবী সম্ভবত তার গায়ের জামাটি পরিবর্তন করে অন্য জামা পরলেন এবং নতুন শাড়িটি পরতে গিয়ে বললেন, জানো আমি কি স্বপ্ন দেখেছি? দেখেছি তুমি আর আমি অজানা কোনোখানে দুই হাত ধরে হাটছি...।

এমন সময় বের হতে চাইলাম। হঠাৎ ভাবী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পাচ ছয়টি চুমু খেলেন।

লজ্জায় আমার মরে যাবার মতো অবস্থা। শুধু ভাবছি ভাবী কি করছেন? আমার অস্বস্তি বোধের জন্য ভাবী আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, কি লজ্জা, দেখো আমাকে।

বাড়িতে ফিরে আসরের নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বাচিয়েছো। সেই থেকে মেয়েদের দেখলে আরো ভয় পাই। কসম দিয়েছি অন্যের শাড়ি আর কখনো কিনবো না।

*ষষ্ঠিতলা, যশোর থেকে*

## মায়ের মুখ

– মোতাহের

বয়স হওয়ার পর থেকেই মাকে দেখতাম নামাজের সময় পরনের শাড়ি বদলিয়ে নামাজ পড়ার জন্য শাদা একটি শাড়ি পরে নিতেন। শাদা শাড়িতে মাকে অসম্ভব সুন্দর লাগতো। মনে হতো আকাশের একটা শাদা পরী ভুলক্রমে আমাদের বাসায় চলে এসেছে।

বেকারত্বের পালা শেষ করেই চাকরি জীবনের প্রথম বেতন পেলাম। বেতন পেয়েই আর দেরি করিনি। সোজা রিকশা নিয়ে আগ্রাবাদে টাঙ্গাইল শাড়িঘরের শোরুমে হাজির হলাম। দোকানিকে বললাম নামাজের জন্য শাদা দেখে একটা শাড়ি দিতে। শাদার ভেতর পাড়ের মধ্যে হালকা কাজ করা একটি শাড়ি বেশ পছন্দ হলো।

মনটা ভীষণ ভালো লাগছে। প্রথম বেতনের টাকা দিয়ে মাকে শাড়ি কিনে দিচ্ছি ভাবতেই ভীষণ আনন্দ লাগছে। বাসায় ফিরে সোজা মাকে বললাম, মা, দেখো তো শাড়িটা কেমন! নামাজের জন্য এনেছি।

মা শাড়ি পরলেন, কিন্তু শাড়িটা ছোট হয়েছে।

শাড়িরও যে মাপ আছে তা জানতাম না। আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

মা আমার মন খারাপ ভাব দেখে বললেন, শাদা শাড়ি একটু ছোটই হয়। তুই মন খারাপ করিস না।

আমার খুশির জন্য মা সেই ছোট শাড়িটা পরেই নামাজ পড়তেন।

আজ মায়ের কাছ থেকে আমি অনেক দূরে। আজ কেবল টেলিফোনের মাধ্যমেই মায়ের আদর পাই। কতোদিন মাকে নামাজ পড়তে দেখি না, মায়ের প্রিয় মুখখানি দেখি না।

আজ কেবলই প্রতীক্ষা।

কবে যে দেশে ফিরবো!

*দোহা, কাতার থেকে*

# চাকরি

– লিলি

দশ ভাইবোনের সংসারে বাবার জমিদারি ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। খাওয়া–পরা, তারপর এতোগুলো ভাইবোনের পড়ালেখার খরচ বহন করার সাধ্য কমে আসছিল। হঠাৎ করেই চাকরির চিন্তা মাথায় এলো। বাবার শত সাধ আমাকে ডাক্তারি পড়াবেন। অন্তত ডাক্তারি পড়ার উপযুক্ত না হলেও দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ভালো চাকরি করবো এটাই আশা।

চাকরির দরখাস্ত দেয়ার কথা শুনেই বাবা রেগে গেলেন। শেষ পর্যন্ত সবার পরামর্শে ইন্টারভিউ দিলাম এবং ইন্টারভিউ–এ প্রথম হলাম। অন্তত বাবাকে এই বলে বোঝালাম যে, চাকরি করায় তো কোনো দোষ নেই। তাছাড়া চাকরি করে কতোজনই তো পড়ালেখা করছে।

যাহোক, কয়েকদিনের মধ্যে জয়েনিং লেটার পেলাম। সেই সঙ্গে ট্রেনিং করতে যেতে হবে এবং কি কি নিতে হবে তার একটা ফর্দও পেলাম। ফর্দে অনেক কিছুর মধ্যে একটা লালপেড়ে শাদা শাড়ি, লাল ব্লাউজ এবং শাদা পেটিকোট নিতে হবে।

আমার জীবনের প্রথম শাড়ি, তাও লালপেড়ে শাদা শাড়ি। বাবাকে বললাম না এই শাড়ির কথা। কারণ আমি জানি, সামান্য দামের শাড়ি হলেও বাবার পক্ষে জুলুম হবে। জীবনে অনেক ঘটনা থাকে যা কখনো কোনো অবস্থাতেই ভুলে যাওয়া যায় না। আমার শাড়ি কেনা হলো না। শাড়ি ছাড়াই ট্রেনিংয়ে চলে গেলাম। কিন্তু শাড়ি ছাড়া ট্রেনিং সেন্টারে ঢুকতে দেয় না। অগত্যা আপুর একটা লাল–খয়েরি সিল্ক শাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহের ওয়াদা করে ওই শাড়ি পরেই ট্রেনিং করেছি।

আমার ট্রেনিং সেন্টারে সখিনা বলে এক আয়া ছিল। বড়আপার নামের নাম বিধায় আমাকে সে ছোটবোনের মতোই দেখতো। ওই আয়া দোকান থেকে একটা শাড়ি এনে দিল এই বলে যে, ট্রেনিংয়ে টাকা পেলেই দিয়ে দেবো। যাহোক, সে যাত্রা বাচলাম।

ট্রেনিং শেষে অফিসে যোগদান করলাম। শাদা শাড়ি পরে তো আর অফিসে যাওয়া যায় না। শাড়িটা আমার ছোটদাদিকে দিয়ে দিলাম এবং আমি সালোয়ার–কামিজ পড়েই অফিস করি। একে তো বয়স অল্প। তার ওপর আমার স্বভাবে, গায়ে ছাত্রীর গন্ধ। যদিও শাড়ি আমার পছন্দের পোশাক। কিন্তু বিয়ের আগে শাড়িই যদি নিত্যদিনের পোশাক হয়ে যায় তাহলে কেমন হয়? তাছাড়া এই বয়সে শাড়ি পরা আপুরাও পছন্দ করেন না।

অফিসে গুঞ্জন শুরু হলো। চাকরি এবং বয়সের দিক থেকে সবার চেয়ে জুনিয়র ছিলাম বলে যে যা মন্তব্য করে, সব মুখ বন্ধ করে সহ্য করতাম। তখন যে বেতন পেতাম, বাবার হাতে তুলে দিয়ে যা থাকতো তা শাড়ি কেনা তো দূরে থাক, আমার হাতখরচই হতো না। এভাবে চললো বেশ কিছুদিন।

একদিন ঈশ্বরদী ইনডিয়ান মার্কেটে গেলাম। অল্প দামে সুন্দর সুন্দর শাড়ি পাওয়া যায়। সাড়ে চারশ টাকায় একটা শিয়ালি রঙয়ের পৃন্টের সিল্ক শাড়ি কিনলাম। ব্লাউজ পিস সঙ্গেই ছিল। পেটিকোট এবং ব্লাউজের জন্য শাড়িটা পরা হলো না।

পরের দিন অফিসে এসেছি। নতুন অফিসার এসেছেন। অফিসারের রুমে এক সিনিয়র আপা বসে। আমি রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আপাটা স্যারকে নালিশের সুরে জানালেন, স্যার, এই মেয়েটা বেয়াদব। অফিসে আসে সালোয়ার কামিজ পরে।

স্যারও ওনার কথার সঙ্গে তাল মেলালেন। আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

তারপর থেকে শাড়ি পরি। কিন্তু ঠিক মতো হাটতেও পারি না। আবার বুকের কাপড় কখন যে পড়ে যায়, কখন যে কাপড় উঠে গিয়ে পেটটা বেরিয়ে পড়ে, নয়তো কুচি খুলে যায় ঠিক পাই না। তার জন্যও কথা শুনতে হয়। একদিন জুতার নিচে পড়ে শাড়িটা যা হওয়ার হলো। আর পরতে পারলাম না।

এর বেশ কিছুদিন পর। একদিন ওটি রুমে দাড়িয়ে বার বার শাড়ি ঠিক করছি। এই দৃশ্য আমার মেডিকাল অফিসার ফলো করেছেন। তিনিও নতুন এসেছেন এবং আমার ভাইয়ের বন্ধু বিধায় আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি বলেই ফেললেন, লিলি, তুমি এখন থেকে সালোয়ার কামিজ পরেই অফিসে এসো। আমি যখন চিটাগাং ছিলাম তখনকার মেয়েরা সব সালোয়ার কামিজ পরে অফিস করতো।

যে আপা আমার আরেক অফিসারের কাছে নালিশ করেছিলেন ওনার সামনেই স্যার এ কথা বললেন। তিনি কাচুমাচু করলেন, প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন না।

আমার জয় হলো। আর কারো কথায় *নো কেয়ার করেঙ্গা।* তারপর থেকে অফিস কথার দূষণ মুক্ত হলো।

*হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা থেকে*

## কুশী ও খুশি

– ফয়সাল রহমান

একদিন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে কুশীকে দেখেছিলাম নীল শাড়িতে। আটোসাটো শাড়ির আচলের নিচে ঢাকা ওর রূপ–যৌবন যেন উপচে পড়তে চায়। অনেক তো দেখেছি ওকে। কিন্তু এভাবে দেখিনি কোনোদিন।

হাত নেড়ে কাছে ডেকে সবার চোখের আড়াল করে মৃদু স্বরে বললাম, চল পালাই, আগে আমাদের কাজটা সেরে আসি।

ও একটু হেসে দিল। পূর্ণিমার চাদ যেন এই অবেলায় আকাশে নয়, আমার হাতের নাগালে।

বললো, আমি তো আর চুরি হয়ে যাচ্ছি না এবং হলেও খোয়া যাবো না। তোমারই থাকবো। অতো তাড়া কিসের।

উহ, নীল শাড়িতে তোমাকে যা লাগছে না!

শাড়িটি আমারও খুব পছন্দ। আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে আজকের জন্য ধার করেছি।

খুব খারাপ লাগলো। অক্ষম আমি যাকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি তাকে একটি শাড়ি উপহার দিতে সক্ষম না। আর সক্ষম হবোই বা কি করে? মায়ের কাছ থেকে ধান্দাবাজি করে যা কিছু পাই তাতো চা

এবং সিগারেটেই ঘাটতি পড়ে। ভাবলাম, আমি যদি এক মাস চা–সিগারেট বাদ দিই তবে যে টাকা বাচবে তাতে অনায়াসে একটি ভালো শাড়ি পাওয়া যাবে।

যে সিদ্ধান্ত সেই কাজ। দেড় মাসের ভেতর ঠিক সে রকম একটি শাড়ি কিনে ফেললাম। কিন্তু দিই কিভাবে। ওদের বাড়ি গিয়ে শাড়ি দেয়া সম্ভব নয় কারণ ওর বড় ভাই খুব কড়া। আর শাড়িটা কোমরে গুজে কলেজ ক্যাম্পাসে কুশীলবের সন্ধান করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একটা ভরসা আছে, কুশী মাঝে মধ্যে একাউনটিং সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের বাড়ি আসে। এ হিসাব মূলত কম্পানির ব্যালান্স শিট নয়, বরং সবার চোখে ধুলা দিয়ে ভালোবাসার হিসাব, বড়ই জটিল। তাই অধিকাংশ সময়ে ব্যালান্স মিলতো না।

আজ বাড়িতে আমি একা, মনটা বড়ই অস্থির। আকাশের অবস্থাটাও বিশেষ ভালো না। টিপ টিপ বৃষ্টি, কখনো আবার অঝোর ধারায় বয়ে চলছে। আজ হয়তো কুশী কলেজে আসবে না যে, কলেজ গেটে অপেক্ষা করবো। হঠাৎ দরজায় ঘা পড়লো।

আন্টি দরজাটা একটু খুলুন, ভিজে গেলাম যে।

দরজা খুলে দেখি ওর সালোয়ার কামিজ বৃষ্টির জলে শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে কুচকে–মুচকে লেগে আছে। রাতের আধারেও যেমন আকাশের তারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় ঠিক তেমনি পোশাকের অন্তরালেও গোপন কিছু আর অগোচরে নেই।

আমি ওকে বেডরুমে নিয়ে গেলাম। শাড়িটা হাতে দিয়ে বললাম, এটি তোমার জন্য কিনে ছিলাম। খুব মানাবে তোমায়। ভেজা কাপড় বদলিয়ে এসো।

কিন্তু কুশী শাড়ি পরায় খুবই অপটু। সেদিন ওর ভাবীই ওকে শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছিল। ভাবলাম, শাড়ি পরায় আমি ওকে একটু সাহায্য করি। কুশীর তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে শাড়ি পরাতে গিয়ে এক নতুন কুশীকে আবিষ্কার করলাম। মেঘের আড়ালে ঢাকা সূর্যের ওপর থেকে হঠাৎ মেঘ সরে গেলে প্রকৃতি যেমন ঝলসে উঠে, দীপ্তিময় হয়, আমার চোখের দশাও অনেকটা সে রকম।

বাইরে মুষলধারার বৃষ্টি যেন নর্তকির অবিরাম নূপুরের সুর। দরজা–জানালা বন্ধ। আকাশে বিজলি চমকানোর তর্জন–গর্জন। ভেতরে নির্জন পুরীতে ক্লান্ত দুটি মানব–মানবী। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, ভীরু স্পন্দন। বুক ফাটা তৃষ্ণা। দেখলাম কুশী জগ থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি ঢেলে নিল। ওর লজ্জাবনত মুখের হাসি দেখে বুঝলাম, শুধু আমি নয়, কুশীও খুশি।

*ফকিরহাট, বাগেরহাট থেকে*

## টিয়ানা

– এস.এস.আর

ইন্টারনেটে চ্যাট (Chat) করা আমার প্রিয় বিষয়গুলোর একটি। আর নানান দেশের নানান ধর্ম–বর্ণের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলা, মতামত দেয়া–নেয়া এমনকি পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে যে সব কথা কখনো বলবো ভাবতেই পারিনি তেমন গোপনীয় কতো কথা যে এক সময় বলেছি অনেকক্ষণ ধরে তার কোনোই হিসাব নেই। তবে কারো সঙ্গেই তেমন চ্যাট করা হয়নি কেবল টিয়ানা ছাড়া।

টিয়ানা সুইডেনের মেয়ে। ও লেভেলের ছাত্রী। রাজধানী স্টকহোমেই বাস তাদের। ব্রোকেন ফ্যামিলির টিয়ানা থাকে তার মায়ের কাছে। বড় ভাই আমেরিকার হাওয়াই প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তার ভাষ্য মতে ভাই বোনের মধ্যে মিল ভালোই।

এ টিয়ানা–ই তার গল্পের মায়াজাল ছড়ালো আমার ওপর। চ্যাট চলতে লাগলো প্রতিদিনই। গভীর রাতে পড়া শেষ করে বসে প্রায়ই ফজরের আজান শুনে ঘোর কাটে। হ্যা, তার সঙ্গে গল্প করার সময়টাতে কেমন একটা ঘোরের মধ্যেই যেন থাকি।

প্রায় আট মাস পর যখন সে বাংলাদেশে আসতে চায় তখন পুরো অবাক হয়ে যাই। না বলতে পারি না। আসলে আমরা জাতিটাই যে খুব অতিথিপরায়ণ! কিন্তু রাগ লাগে যখন সে সরাসরি আমাদের বাসায় উঠতে অসম্মত হয়। তার ধারণা আমাদের দেশ পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল। এমন কোনো সাজে আমাদের ঘরে সে আসবে না যাতে আমার পরিবারের কেউ বিন্দুমাত্র অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

২০০০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আসে টিয়ানা। হোটেলে সিট আগেই বুক করে রেখেছিলাম। যদিও হোটেল ভাড়ার টাকা আমাকে সে দিতেই দেয়নি। রুম বুঝে নিয়ে, ফ্রেশ হয়ে আমার সঙ্গে এমনি একটু বের হলো সে। জানতাম, যানজট আর কালো ধোয়া নিয়ে লেকচার দেবেই। আশঙ্কা মিথ্যা হয়নি। কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হলাম যখন সাধারণ একটা জিনিস তার চোখে লেগে গেল। শাড়ি! রাস্তায় প্রায় সব বয়সের মেয়েরাই শাড়ি পরে চলছে। বায়না ধরলো শাড়ি কিনবে। ঢুকলাম ইস্টার্ন প্লাজায়। দেখে দেখে ছয়টা শাড়ি কিনে ফেললো!

হোটেলে এসে হুশ হলো! একে তো টিয়ানা শাড়ি পরতে জানে না, তার উপর তার মাপের পেটিকোট, ব্লাউজই বা এখন কোথায়? তো ছোটো আবার। তার কোমর, বুক আর উচ্চতা জেনে নিউ মার্কেটে আমার পরিচিত এক দোকানে গেলাম তাকে হোটেলে রেখে। কিনে আনলাম এগুলো।

পরদিন। জীবনের মহাস্মরণীয় একটা ঘটনা ঘটলো বিকেলে। টিয়ানা জিজ্ঞাসা করলো আমি শাড়ি পরাতে জানি কি না।

ক্যাডেট কলেজে পড়ার সময় আন্তঃহাউস নাটক প্রতিযোগিতায় নারী চরিত্রে অভিনয়ের দরুন ব্যাপারটায় আমি অভিজ্ঞ! সরল মনে হ্যা সূচক জবাব দিলাম।

খুশিতে লাফিয়ে উঠে সে বললো তাকে শাড়িটা পরিয়ে দিতে।

এবার যেন মাথায় বজ্রপাত হলো। বুঝিয়ে বললাম শাড়ি পরতে চাইলে তাকে আমার সামনে অর্ধনগ্ন হতে হবে। বার দুয়েক এটা বলতেই ক্ষেপে উঠলো সে।

Strange! you are my friend and you are hesitating! I never thought you so stupid – কি অদ্ভুত। তুমি আমার বন্ধু – আর তুমিই দ্বিধা করছো! আমি তোমাকে কখনো এতো স্টুপিড ভাবিনি।

কানে বাজে এখনো। রাজি হলাম, অনুরোধে ঢেকিও তো গেলা যায়!

নিজেকে আমার ওপরই যেন ছেড়ে দিল সে। হাত দুটি উপরে তুলে ধরে ইশারা দিল তার গেঞ্জিটা খুলে দিতে। গেঞ্জি আর জিনস প্যান্ট কাপা হাতে খুলে ফেললাম। ব্রা দিয়ে বন্দী তার অবাধ্য দুটি স্তনের ওঠানামা দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। নাভির পাচ আঙুল নিচে ত্রিভুজাকৃতির প্যান্টি

দিয়ে ঢাকা তার শ্রোণিদেশের মিলনস্থল। গরম নিঃশ্বাসের শব্দ পেলাম দুজনেরই। হিতাহিত ভুলে শক্ত করে ঠোট দুটো কামড়ে ধরলাম তার। সে জড়িয়ে নিল আমাকে। নিজেকে আবিষ্কার করলাম অজানা রহস্যময় সুড়ঙ্গের এক অভিযাত্রী হিসেবে। অবহেলায় পাশে পড়ে রইলো তার জন্য কেনা শাড়ি, পেটিকোট আর ব্লাউজ।

বিকেলে শাড়ি পরিয়ে আমাদের বাসায় নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলাম। বের হওয়ার সময় হঠাৎ খেয়াল হলো, শাড়ির সঙ্গে তো তার পরে আসা বুট শু আর মোজা চলবে না। এখন উপায়?

তার জন্য এবার হিলওয়ালা বা অন্য জুতা কিনতে যেতে হবে। ভেবে পেলাম না কাদবো, নাকি হাসবো। এক শাড়ি পরাতে গিয়ে কতো কিই না হলো!

*খুলনা থেকে*

## টাঙ্গাইলের সুতি

তখন সবে মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয়েছি। ক্লাসে মন দেয়া ঠিক মতো হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মেডিকালের দুর্বোধ্য গৃক ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ব করা সত্যিই জ্বালাতন মনে হচ্ছিল তখন। তাই ফাক পেলেই বাড়ি যেতাম।

সেবার বাড়ি গিয়ে এক নতুন মহিলাকে আবিষ্কার করলাম। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, রঙ ফর্শা, দোহারা গঠন। মা পরিচয় করিয়ে বললেন তোর ভাবী। পাশের গ্রাম থেকে এসেছেন। আমি পরিবারের বড়ছেলে। তাই ভাবীর আদর বলতে কখনো কিছু জোটেনি।

খাওয়া–দাওয়া সেরে ভাবীকে নিয়ে বসলাম গল্প করতে। জানলাম ভাই থাকেন ঢাকায়। চার পাচ মাসে একবার আসেন। বাড়িতে শ্বশুর–শাশুড়ি, ছোট ননদ আর ওনার তিন বছরের এক কন্যা সংসারে খুব একটা সচ্ছলতা নেই। এও জানলাম, আমাদের বাড়িতেই থাকবেন এবং মাকে সাহায্য করার জন্যই এসেছেন।

একদিন রাতে টেবিল চেয়ারে বসে বন্ধু আসোর কাছে চিঠি লিখছিলাম। কতোক্ষণ লিখছিলাম জানি না। পিঠে হঠাৎ নরম কোনো কিছুর স্পর্শে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি ভাবী মিটিমিটি হাসছেন।

বললাম, এতো রাতে এখানে কেন? যান ঘুমান। মা টের পেলে কি মনে করবেন।

তিনি বললেন, খুব চেষ্টা করেও ঘুম আসছে না। তাই গল্প করতে এলাম তোমার সঙ্গে। আমার দুটো জিনিস চাওয়ার আছে তোমার কাছে।

এই বলে তিনি আমার বিছানায় বসলেন। শুধু তাই নয়, শুয়েও পড়লেন বুকের আচল সরিয়ে।

আমার তো আত্মারাম খাচাছাড়া। এমনিতেই জীবনে কোনো মেয়েকে কাছ থেকে দেখিনি। বিশেষ করে এমন ভঙ্গিতে। মাথাটা ইতিমধ্যেই ঝিমঝিম করছে। ভাবীকে কোনোমতে বুঝিয়ে বললাম, প্লিজ, চলে যান। আমার খুব খারাপ লাগছে।

তিনিও কি মনে করে কথা না বাড়িয়ে উঠে দাড়ালেন। শুধু যাবার সময় মাথায় একটা চাটি মেরে বললেন, পুরুষ! নাকি কাপুরুষ?

চিঠি লেখা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এলো না কিছুতেই। বার বার ওই কথাটিই কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সিদ্ধান্ত নিলাম, ঠিক আছে, দেখিয়েই ছাড়বো।

পরের দিন সকালেই ওনাকে কাছে ডেকে বললাম, আজ রাতে আসবেন, কথা আছে।

রাতে আগের মতোই অপেক্ষা করছিলাম দরজা খুলে দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। আসা মাত্রই কোনো মতে দরজাটা লাগিয়ে জাপটে ধরে বললাম, আজ পুরুষত্বের প্রমাণ করিয়েই ছাড়বো। তিনি হালকাভাবে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাকে পুরোপুরি নগ্ন করলাম। যা দেখলাম তা বর্ণনাতীত। সেদিন সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটলো।

সব শেষে বললাম, কেমন! পারলাম তো পুরুষত্বের প্রমাণ দিতে?

তিনি শুধু খু–উ–ব বলেই চলে গেলেন।

পরদিন তার দিকে তাকাতে কেমন লজ্জা করছিল। এরপর, তাকে ঘরে ডেকে বললাম, আজই রাজশাহীতে চলে যাবো। কি আনবো আপনার জন্য?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। বহুবার মিলিত হয়েছি আমরা। পরে জেনেছিলাম, টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি পরার তার খুব শখ। কিন্তু সামর্থ না থাকায় হয়ে ওঠেনি এবং আমার দ্বারাই তার দ্বিতীয় শখটিও পূরণ করেছেন।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*রাজশাহী মেডিকাল কলেজ থেকে*

## অনাকাঙ্ক্ষিত

– মমতা হাছান লতা

আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রিয় বন্ধু যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডির সাক্ষী হয়ে অবতীর্ণ হবে তা কখনো চিন্তাও করিনি। দৃশ্যটা যখনই চোখের সামনে ভেসে উঠে, আমার হৃদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

সেই ছোটবেলা থেকে শাড়ির প্রতি ছিল আমার ভীষণ দুর্বলতা। কতোবার মায়ের জন্য আনা নতুন শাড়ি প্রথম পরে ছিড়ে এনে মায়ের কানমলা খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শাড়ির অমর প্রেমিক হিসেবে আমার থেকে অনেক দূর এগিয়ে ছিল আমার ফুপাতো বোন ফেরদৌসি।

সে ছোট এবং তার বাবার একান্ত প্রিয় হওয়ার সুবাদে তার আবদার ছিল নিতান্তই অগ্রগণ্য। তার দাবি অনুযায়ী বাবা তাকে কয়েকটা নতুন শাড়ি এনে দিয়েছিলেন। ছোট, সুন্দর এ শাড়িগুলো পেয়ে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতো।

আমি যখন তাদের বাড়ি যেতাম তখন পাচ বছর বয়সের ফেরদৌসি ভাঙা এবং তোতলানো কণ্ঠে আমাকে বলতো, আপু, আমার সুন্দর শাড়ি আছে, তুমি পরবে?

আমার খুব হাসি পেতো। বলতাম, তোমার শাড়ি তো আমার পরনে হবে না, আমি যে বড় হয়েছি। তুমি যখন বড় হবে তখন তোমার শাড়ি আমিও পরবো, কেমন!

তার শাড়ি উপেক্ষা করা হলো বলে সে তখন মুখ গোমড়া করে খেলতে চলে যেতো।

ফুপার যতো অভাব অনটনই থাক না কেন, মেয়ের খুশির জন্য তিনি সর্বস্ব বিলীন করতেও প্রস্তুত। হয়তো ফুপুর শাড়ি প্রয়োজন। কিন্তু সেদিকে ফুপার খেয়াল নেই। তিনি ফেরদৌসির ফরমায়েস নিয়ে ব্যস্ত।

মেয়ের প্রতি বাবার আদিখ্যেতা দেখে ফুপু রাগে গজ গজ করতেন। বলতেন, মেয়েকে চাদে একটা বাড়ি বানিয়ে দাও। না হলে চাদটাই ছিড়ে এনে মেয়ের হাতে দাও। মেয়ে বুঝি দুনিয়ায় আর কারো নেই। এতো আদর ভালো নয়।

ফুপু একদিন ফেরিওয়ালা ডেকে নিজের জন্য দুটো শাড়ি কিনলেন। ফেরদৌসিকে আর আটকায় কে। তাকেও শাড়ি কিনে দিতে হবে। ফেরিওয়ালার কাছে ছোট শাড়ি ছিল না। অগত্যা নিজের কেনা দুটো শাড়ির একটা ফেরদৌসির হাতে দিয়ে ফুপুকে বলতে হলো, এটা তোমার জন্য।

ছোট মনে সান্ত্বনা সত্যি মনে করে নেচে উঠে সে বায়না ধরে, পরিয়ে দাও।

ব্যস্ততার মাঝে ফেরদৌসির এই অকারণ জ্বালাতনে বিরক্ত বোধ করেন ফুপু। কিন্তু ফেরদৌসি নাছোড়বান্দা। শাড়ি দুই ভাজ করে কোনো রকম কোমরে পেচিয়ে আচলটুকু গায়ে দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দেন ফুপু। খিল খিল করে হেসে ফেরদৌসি খেলতে চলে যায়। শুরু হয় চড়ুইভাতি খেলা। ফেরদৌসি নতুন বধূ। তাই রান্নার দায়িত্ব তার।

শরীরের তুলনায় কয়েকগুণ বড় শাড়ি নিয়ে, শাড়ির ভারে ন্যুব্জ ফেরদৌসি রান্নায় মত্ত। সবার অজান্তে এক সময় শাড়ির এক কোণে আগুন লেগে যায়। চিৎকার করে উঠে সে। মায়ের কাছে ছুটে আসতে চাইলে তার সঙ্গী-সাথীরা বকা খাওয়ার ভয়ে তাকে আটকিয়ে দেয়। নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। চিৎকার-চেচামেচি শুনে প্রতিবেশী লোকজন সবাই ছুটে আসে। দিশেহারা ফেরদৌসি আগুনের তীব্র যন্ত্রণায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। এতোক্ষণে ফুপু সংবাদ পেয়ে এসে মেয়েকে এ অবস্থায় দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সবাই খালি হাতে আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে। ততোক্ষণে সব শেষ। সম্পূর্ণ শাড়ি পুড়ে ফেরদৌসির সমস্ত শরীর ঝলসিয়ে আগুন আস্তে করে নিভে গেল।

ফেরদৌসিকে রংপুর হাসপাতালে নেয়া হলো। কিন্তু অবস্থার শুধু অবনতিই হতে থাকলো। ফেরদৌসি তো নয় যেন একদলা দগদগে মাংসপিণ্ড। পরদিন বিকেলে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান ফিরলো ফেরদৌসির। কোনো সুদূরের পার থেকে সে আস্তে করে ডাকলো মা...! আকুল চোখে মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে তার মুখের ওপর মুখ রাখলেন মা।

আশ্চর্য! মিটমিট হেসে ফেরদৌসি বললো, মা, তোমার শাড়ি পুড়ে গেছে বলে রাগ করেছো? আমি আর কখনো শাড়ি পরবো না মা! কখনো না!

এটাই ছিল ফেরদৌসির শেষ কথা। এরপর জীবনের প্রয়োজনে শাড়ি পরতেই হচ্ছে। কিন্তু যখনই মনে পড়ে এ দুঃসহ স্মৃতি, আকর্ষণীয় এ বস্তুটিকে তখন বড়ই অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হয়।

*গোলমুণ্ডা, জলঢাকা, নীলফামারী থেকে*

# অসহ্য

– মোহাম্মদ সাজজাদ আলম

আর কতোদিন চাদ তারাকে আমার সঙ্গে তুলনা করবে? কতোদিন মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে রাত কাটাবে? স্বপ্নরাজ্য ছেড়ে এবার বাস্তবতায় এসো। তেমন কিছুই তো চাইনি। ঈদে শুধু একটাই শাড়ি চেয়েছি। এতেই তোমার গলা শুকিয়ে কাঠ? বিয়ের আগে বলেছিলে গয়না দিয়ে মুড়িয়ে দেবে আমায়, গাড়ি হবে বাড়ি হবে, আমাদের। কই? কিছুই তো হলো না। সব তোমার ভাওতাবাজি। এই ঈদে শাড়ি চাই–ই চাই। শাড়ি না দিলে রোজ কেয়ামত ঘটিয়ে দেবো বলে দিলাম। তোমার মতো হাড়কিপটা এ জনমে দুটি দেখিনি। আগে জানলে কখনো তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করতাম না। গলায় দড়ি দিতাম তবু তোমার ঘরের বৌ হতাম না। কঞ্জুস কোথাকার।

এটি নাটকের প্রথম দৃশ্য।

পাশের বাড়ির ভাবীর নতুন শাড়ি দেখে গতকাল রাত থেকে চলছে বৌ–এর এই রিহার্সাল। আমি বসে ভাবি কি বৌ কি হয়ে গেল। বিয়ের আগে বলতো তার নাকি হবি, গান শোনা ও বই পড়া। এখন দেখি তার হবি শুধু শপিং, শপিং আর শপিং।

বৌ–এর এতো গুতো খেয়ে আমি যখন কথা বলছি না তখন শুরু হলো কান্না। কান্না তো নয় যেন মুষল ধারে বৃষ্টি, এ বৃষ্টিতে সে ধুয়ে দিতে চাই আমার সকল কিপ্টেমিকে। বাধ্য হয়ে শপিংয়ে নিয়ে যাবো বলতে হলো। পরিতৃপ্তির হাসি এলো বৌ–এর মুখে যেন নতুন কোনো মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

অবশেষে বৌ–কে নিয়ে শপিংয়ে গেলাম। শপিং সেন্টারে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটেছে। পা রাখার জায়গা নেই। মানুষ আর মানুষে গাদাগাদি। গরু ছাগলের হাটেও এর চেয়ে কম ভিড় এবার দেখলাম বৌ–এর নতুন রূপ যেন *আলিবাবা চল্লিশ চোরের* গুপ্ত ধন পেয়ে গেছে। কোন দোকান রেখে কোন দোকানে যাবে, কোনটা রেখে কোনটা নেবে এই ভেবে সে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে নাচানাচি করে চলেছে। বেহুদা দোকানিরা *আপামণি, দিদি* বলে মিষ্টি সুরে ডাকছে। বৌ আমার পাগলের মতো সেদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমি ধীরে ধীরে হাটছি বলে বৌ হাত ধরে টান দেয় যেন আমি কোরবানির কেনা নতুন গরু। মালিকের বাড়িতে যাচ্ছি না বলে এতো পীড়াপীড়ি।

বৌ–এর সঙ্গে সারাদিন এভাবে ঘুরে আমার সর্ব শরীর ব্যথা। মনে হচ্ছে আমার শরীরের শিরা ও উপশিরাগুলো ছিড়ে গেছে। হাড়গুলো সব স্থানচ্যুত হয়েছে। এরই মাঝে সুন্দরী ললনাদের পেনসিল হিলের খোচা খেয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে রক্ত ঝরছে। শরীর ঘেমে কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। গায়ের শাদা শার্ট আর চেনার উপায় নেই। মনে হচ্ছে কয়েক বছর না কেচে গায়ে দিয়েছি। বিদেশি শাড়ি এখানে পাওয়া যায় সাইনবোর্ডে লেখা দেখে বৌ সেই দোকানের সামনে যাবে। দোকানে এতো ভিড় যে ভেতরে ঢোকার সাধ্য কারো নেই। আমাকে দাড় করিয়ে রেখে বাসের কন্ডাকটারের মতো সাতরিয়ে বৌ ভেতরে ঢোকে। হেলপারের মতো আমি বাইরে দাড়িয়ে থাকলাম।

এর মাঝে দোকানদার আমার বৌ–কে কয়েকশ শাড়ি দেখিয়ে ফেলেছে। একটা শাড়ি পছন্দ করাতে দোকানদার সাত হাজার টাকা দাম চেয়ে বসলো। আমার বৌও কম সেয়ানা না। সে তিন হাজার

টাকা দেবে জানালো। এভাবে দরদাম করে পাচ হাজার টাকায় শাড়ি কিনলো। শাড়ি কেনার পর বৌ–এর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি যেন যুদ্ধে জয়ী হওয়া সেনাপতি। শাড়ির প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বললো, বাড়ি চলো।

বাড়ি ফিরে চোখে অন্ধকার দেখি। আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখি আমি হসপিটালের বেডে শুয়ে আছি। বৌ ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে আর বলছে, একটা মাত্র শাড়ি নিয়েছি তাই হার্টফেল করলে? তোমার এমন হবে জানলে আমি শাড়ি নিতাম না।

অ্যা–অ্যা–অ্যা–কান্নার সুর।

উহ অসহ্য!

*চৌড়হাস, কুষ্টিয়া থেকে*

## নীল বৌ

– মেহেদী হাসান

ক্লাস শেষ করে বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে রুমে ফিরেই অনামিকার চিঠিটি পেলাম। হলুদ খামের তিন চার লাইনের একটি চিঠি। তাতে লেখা –

*সৈকত,*

*আজ আমার জীবনের এক কঠিন অধ্যায়ের সম্মুখীন আমি। এ দিনে তোর মতো বন্ধুর সাহায্য কি কামনা করতে পারি না? চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবি।*

*–অনামিকা*

আর কিছু লেখা নেই। পড়ে ভাবলাম অনামিকা হয়তো মজা করার জন্য লিখছে। কারণ সব সময় মজা করতে সে ভালোবাসে। আবার ভাবলাম এমন সিরিয়াস কথা তো কোনো চিঠিতে লেখেনি। তবে কি সত্যিই অনুর কোনো অসুবিধা? আর কিছু না ভেবে পরদিন সকালবেলা হালকা কিছু পোশাক–আশাক নিয়ে বাসার উদ্দেশে রওনা দিলাম। অনামিকার বাসা আমার বাসা থেকে দশ মিনিটের পথ। ভাবলাম আগে তো নিজের বাসায় পৌছাই তারপর অনামিকার কাছে যাওয়া যাবে। ঝড়ের গতিতে চলছে আন্তঃনগর এক্সপ্রেস। এবং আমার মনের ক্রিয়াগুলো তার চেয়ে দ্রুতগতিতে। কি হতে অনামিকার কি হলো কে জানে! এমন প্রাণোচ্ছল মেয়ের বিপদ। ভাবাই যায় না। বিকেলের দিকে বাসায় পৌছালাম। মনে মনে ভাবলাম এখন একটু বিশ্রাম করি। রাত বা পরদিন সকালে গেলেই হবে।

পরদিন সকালে অনামিকাদের বাসায় পৌছাতেই দেখি অনামিকা কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে। চোখের নিচে কালি, চুল আলুথালু অথচ মুখটা আশ্চর্যজনক শান্ত ও গম্ভীর। যেন অভূতপূর্ব এক প্রশান্তি এসে গিয়েছে আমার আগমনে। দীর্ঘ সাত বছরের পরিচয়ের কোনো সময়ে কোনো উপলক্ষে অনুকে এতোটা গম্ভীর মনে হয়নি, এখন যতোটা মনে হচ্ছে।

বললো, আমি জানতাম, তুই আসবি।

বললাম, তোর সমস্যা অথচ আসবো না তা কি করে ভাবলি?

বললো, এ জন্যই তোকে বন্ধুদের মধ্যে এতো ভালো লাগে।

বললাম, এবার আসল কথাটা বল।

অনু যা বললো তাতে একটুও বিচলিত হলাম না, এমনকি আশ্চর্যও হলাম না। তার বিয়ের কথা চলছে প্রবাসীর এক ছেলের সঙ্গে। পাত্রপক্ষ নাকি জবরদস্তি শুরু করে দিয়েছে যাতে সপ্তাহ খানেক–এর মধ্যে বিয়েটা হয়ে যায়। পাত্র বিয়ের পর বৌ নিয়ে বিদেশ চলে যাবে। কিন্তু অনু এ বিয়েতে রাজি নয়। তার মূল কথা হলো, অচেনা একটা ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। আমি অনেক বোঝালাম, কাজ হলো না। শেষে অনামিকা যা বললো তাতে অনেক দিনের চেনাকে হঠাৎ করেই অন্য রকম মনে হলো। তার মুখের আড়ালে আমি আসল অনুকে খুজতে লাগলাম।

বললো, সৈকত, বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে তোকেই করবো, নচেৎ কাউকে নয়।

শুনে আমি বোকার মতো বসে রইলাম। বললাম, কিন্তু আমি তো তোকে প্রেম বা বিয়ে সংক্রান্ত কোনো কথা বলিনি। দীর্ঘ সাত বছরের শিক্ষা জীবনে হাই স্কুল ও কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে দুইজন দুই জায়গায়। তবে কলেজের স্মৃতিময় সময়গুলোতে কখনো কি আমার সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে? তোকে বন্ধুর মতোই জেনে এসেছি। দেখ, এখনো সেই বন্ধুত্বের শিকলটা অটুট। তোর ডাকে এখনো আমি ছুটে আসতে জানি। এখানে বিয়ের প্রশ্ন উঠছে কেন?

অনু কাদো কাদো সুরে বললো, তাহলে সেদিনের সেই কথাগুলো সব তোর অভিনয় ছিল?

মনে পড়ে গেল কলেজের ফেয়ারওয়েল–এর সময়কার কথা। সে দিনটিতে অনুর সে কি সাজ, রীতিমতো অবাক ব্যাপার। নীল শাড়ি পরিহিত এবং কপালে নীল টিপ, খোপায় রজনীগন্ধা। তাকে ঠিক নীল পরীর মতো লাগছিল। অনুকে বলেছিলাম, আমার যেন এমন পরীর মতো একটা বৌ হয়। তখন লজ্জায় মুখ লাল করেছিল অনু।

এ কথা এখনো মনে রেখেছে অনু! অনেক বোঝালাম। দেখি তার চোখ দিয়ে অশ্রু বিন্দুগুলো মুক্তার মতো ঝরে পড়ছে। আর কিছু না বলে চলে এলাম।

তিন দিন পর বাসা থেকে ক্যাম্পাসে ফিরে এলাম। কিন্তু ক্লাস বা পড়াশোনায় মন বসাতে পারলাম না। অনু কখনো আমাকে বলেনি ভালেবাসে, আমিও না। তবে প্রচণ্ড টান অনুভব করতাম তার জন্য। মাঝে মাঝে নীল বৌ বলে খেপাতাম। এটা তো দুষ্টুমি ছিল, সে লজ্জা পেতো। তবে কি দুজনের মনের কোণেই কোনো কিছু লুকানো ছিল? হাজারো প্রশ্ন স্নায়ুকোষে গড়াগড়ি খেতে লাগলো এবং এক সময় তা ভুলে গেলাম। চলতে লাগলো ক্যাম্পাস ও হলের একঘেয়েমি জীবন।

একদিন দুপুর বেলা। ক্লাস নেই। তাই খাতাপত্রগুলোর ধুলো ঝাড়ছিলাম। এমন সময় পিয়ন এসে একটি পার্সেল দিল। উপরের লেখা দেখে চিনলাম এটা অনুর লেখা। পার্সেলটা খুললাম। খুলতেই একটি নীল শাড়ি ও চিঠি পেলাম। অনুর চিঠি। এই প্রথম অনু তুমি করে লিখেছে !

*সৈকত*

*হয়তো ভালো আছো? আমার কথা কি বলবো? গত মাসের ২০ তারিখে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তুমি তো আমাকে গ্রহণ করলে না। তাই বাবা মাকে আর অমত করতে পারলাম না। সেই নীল শাড়িটা তোমাকে পাঠালাম। তোমার বিয়েতে আমার উপহার। দোয়া করি তোমার বৌটা যেন পরীর*

*মতোই সুন্দর হয়। তোমাকে ভুলতে চাইলেও পারবো না। কারণ তুমি আমার প্রথম প্রেম ছিলে। তবে তুমি আমাকে ভুলে যেও।*

*ইতি – তোমার নীল বৌ*

আর কিছু লেখা নেই। নীল শাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

*ময়মনসিংহ থেকে*

# ছিনতাই

– মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

ঘটনাটি কয়েক বছর আগের। একটা টিউশনি পেলাম ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। জীবনের প্রথম টিউশনি। যাহোক, একমাস চার দিনে টিউশনির বেতন পেলাম। যখন ছাত্রীর আম্মা আমাকে টাকাগুলো দিচ্ছিলেন তখন মনের ভেতরে আলাদা একটা অনুভূতি সৃষ্টি হলো।

সেদিন একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম ছাত্রীর বাসা থেকে। বাসায় এসে ভাবছি, আমার জীবনের প্রথম আয় কিভাবে খরচ করা যায়। হঠাৎ মনে হলো মাকে একটা শাড়ি কিনে দেবো আমার প্রথম আয় দিয়ে। ভাবা মতো কাজ করে ফেললাম। সেদিনই মার্কেটে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। কিন্তু যে শাড়ি পছন্দ হয় তা দামে মেলে না। আবার দামে মেলে তো শাড়ি পছন্দ হয় না। এভাবে প্রায় তিন ঘণ্টা মার্কেট ঘুরে কোনো শাড়ি পছন্দ করতে পারলাম না। মার্কেট থেকে বের হয়ে ভাবলাম, শাড়ি কেনার ব্যাপারে মেয়েরা দক্ষ। তাই শাড়ি কিনতে হলে কোনো মেয়েকে নিয়ে আসা দরকার।

পরদিন বিকেলে এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর বাসায় গেলাম তাকে নিয়ে শাড়ি কিনতে যাবো বলে। কিন্তু তার বাসায় গিয়ে দেখি বান্ধবী বেড়াতে গেছে। অগত্যা নিজেই আবার মার্কেটে ছুটলাম শাড়ি কেনার জন্য। একটি দোকানে ঢুকে শাড়ি দেখছি হঠাৎ দেখি আমাদের কলেজের এক শিক্ষিকা। আমাকে দেখে বললেন, তুমি এখানে কেন?

বললাম, মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবো। কিন্তু পছন্দ করতে পারছি না।

শিক্ষিকা বললেন, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে তোমার মায়ের জন্য শাড়ি পছন্দ করে দিই?

আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

যাহোক, আধা ঘণ্টা ধরে খুজে সেই শিক্ষিকা আমার মুখে মায়ের বর্ণনা শুনে একটা শাড়ি পছন্দ করলেন। শাড়িটা আমারও পছন্দ হলো। দাম পরিশোধ করে শিক্ষিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাসায় ফিরছি। রাত প্রায় সাড়ে নয়টা। মেইন রাস্তায় জ্যাম থাকায় রিকশাচালক গলির ভেতর দিয়ে রিকশা চালাচ্ছে। হঠাৎ করে তিন চারজন ছেলে এসে রিকশার গতিরোধ করে। একটু ভয় পেলাম। ছেলেগুলো চাকু বের করে বললো, কি আছে তাড়াতাড়ি দে।

ভয়ে ঘড়ি, মানিব্যাগে রাখা সব টাকা তাদের হাতে তুলে দিলাম। তাদের একজন শাড়ির প্যাকেটটি চাইলো। আমি না করলাম। কিন্তু তারা জোর করে প্যাকেটটি নিয়ে গেল।

তারা চলে যাবার পর আমার খুব কান্না পেল। দামি ঘড়িটা বা মানিব্যাগের টাকার জন্য নয়, মায়ের জন্য কেনা শাড়িটার জন্য।

বাসায় ফিরলাম বিধ্বস্ত মনে। মাকে কিছুই বললাম না ভয় পাবেন বলে। এই ঘটনা বাসার কাউকে জানাইনি। এরপর অনেক টাকা আয় করেছি, মাকে অনেক কিছু কিনে দিয়েছি। কিন্তু জীবনের প্রথম আয় দিয়ে মায়ের জন্য কেনা শাড়িটা যা ছিল মায়ের জন্য আমার প্রথম উপহার তার কথা জীবনেও ভুলবো না। ভুলে যাবো না আমার প্রথম উপহার ছিনতাই হয়ে যাওয়া সেই রাতের কথা।

*হাজারীবাগ, ঢাকা থেকে*

## টিকে থাকা

– আফতাবুজ্জামান

১৯৫৯–এ ব্যাচেলর ডিগ্রি নেয়ার পর মফস্বলের একটা হাই স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলাম। বছর খানেক পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে যুতসই গোছের চাকরির জন্য আবেদন করাই ছিল তখনকার একটা মহাকাজ। অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এতিম ছোট ভাইবোনদের মানুষ করা আর ভাঙা সংসারটাকে চাঙা করার একটা মহান ব্রত নিয়ে জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একদিন গিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে এলাম। স্কুলে সকাল–বিকেল অংকে প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু বাড়তি উপার্জন শুরু করলাম। সে সময়ই সবচেয়ে প্রিয় এক ভগ্নিপতির পীড়াপীড়িতে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়েছিল।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোলাপি রঙের ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়িতে আবৃত স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলাম। আমার ষোড়শী স্ত্রী তখন স্বাস্থ্যবতী, লম্বা–চওড়া, হাসি–খুশিতে ভরপুর। সে দুদিনেই মাসহ বাড়ির সবার মন জয় করে নিল। বৌভাতের পর সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ি গেলাম প্রথমবারের মতো। সেখানে অবস্থানের এক রাতে বেরসিক চোর ঘরে ঢুকে কাপড়–চোপড়ে ভরা স্ত্রীর সুটকেসটা নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গে গেল বিয়ের ব্যাঙ্গালোর শাড়িসহ অনেক কিছু। বাড়ি ফেরার সময় শাশুড়ি তার মার্সেরাইজড টসটসে লাল রঙের ভারি জমিনে মোট শাদা সুতা দিয়ে কাজ করা চ্যাপ্টা পাড়ের শাড়িটি আমার স্ত্রীকে পরিয়ে বিদায় দিলেন। মন কেড়ে নেয়া সুন্দর শাড়িতে তাকে অদ্ভুত লাগছিল। পথে তখনকার দিনের রংপুরের *সাজঘর* নামক জমজমাট দোকান থেকে হালকা গোলাপি রঙের একটি সিল্কের শাড়ি কিনলাম। কিন্তু লাল শাড়িটির কাছে সেটি ছিল খুব ম্লান।

বছর কয়েক আমার পছন্দের কারণেই স্ত্রী এখানে–ওখানে যাবার সময় সেই লাল শাড়িটাই বেছে নিতো বেশির ভাগ সময়। সে শাড়ি তাকে নববধূর বেশে মহীয়ান করে তুলতো।

এক সময় ছেলেমেয়েরা বড় হলো, সংসার বড় হলো। বয়সের কারণে আমার স্ত্রীর চালচলনেও এলো গাম্ভীর্য। লাল শাড়িটা তাই তোলা রইলো স্টিল আলমারির এক কোণে। কদাচিৎ সেটা ব্যবহার হলে ফিরে যেতাম আমার ফেলে আসা দিনগুলোতে। এভাবেই চলছিল। কিন্তু এক সময় আমার স্ত্রীর বড় বিধবা বোন মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে লাল শাড়িটার ভাগিদার দাবি করে কেড়ে নিয়ে গেলেন সেটি। আমরা ব্যথিত হলাম। তবে তার অসুস্থতার কারণে চুপ করে গেলাম। অনেক শাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমার স্ত্রীর মনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হলো। মাঝে মধ্যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে একটা অসম্পূর্ণতার ব্যথায় মনটা অস্থির হয়ে যেতো।

এরপর অনেক বছর গড়িয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর সেই বিধবা বোন পরলোকে গেছেন। কিন্তু শাড়িটা তন্নতন্ন করে খুজে তার বড়িতে আর পাওয়া গেল না। তারপর সেই শাড়ির কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন হলো, বাস্তবায়ন হলো আমাদের বহু কল্পনার, পরিপূর্ণ হলো আমাদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলাম। তাদের কোল জুড়ে এলো আমাদের নাতি-নাতনি। একমাত্র মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে কাটায় তার ব্যস্ত জীবন। এবং এক ছেলে সস্ত্রীক ভিনদেশে গিয়ে সেখানকার নাগরিক হওয়ার প্রচেষ্টারত। আমরা এক সময় খুজে পেলাম রাজধানীতে আমাদের একটা স্থায়ী আবাসস্থল। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও কি যেন একটা খুত সারাক্ষণ আমাদের মনে খচ খচ করে। ছেলেমেয়েদের বিচ্ছিন্নতার কারণে বিষণ্নতা এলো নেমে আমাদের মনে। এভাবে আমার স্ত্রী অসুখে ভুগতে লাগলো। এক সময় খুব অসুস্থ হয়ে গেলে ক্লিনিকে ভর্তি করানো হলো এবং এন্তার পরীক্ষা-নিরিক্ষায় ধরা পড়লো তার দুটো কিডনি বিকল হয়ে গেছে। এখন শুধু ইনজেকশন ও বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করে ডায়ালাইসিসের অপেক্ষায় আছি। তার হাত-পা শুকিয়ে গেছে। সেই নাদুস-নুদুস চেহারা আর নেই। ব্লাউজগুলো তার শরীরের তুলনায় এখন বড় হয়ে গেছে। চামড়া গেছে কুচকে।

এমনি সময়ে একদিন আমার স্ত্রীর এক ভাগ্নে এলো বাড়ি থেকে। সে তার ব্যাগ থেকে বের করলো উদ্ধার করা সেই প্রিয় লাল শাড়িটা যা একটা পুরনো কাঠের বাক্সের এক কোণায় আরো বহু পুরনো কাপড়ের নিচে পড়েছিল অযত্নে। শাড়িটার জৌলুস ঠিকই আছে। তবে সুতাগুলো হয়ে গেছে নরম। হাত দিলেই ছিড়ে যায়।

আমার স্ত্রী শাড়িটা উদাস নয়নে নাড়াচড়া করে সরিয়ে দিল আর তার দুই চোখে নেমে এলো অশ্রুর বন্যা। আমিও নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম এই ছেড়া শাড়িটা হয়তো আরো কয়েক বছর স্মৃতি হয়ে থাকবে আমাদের মাঝে। কিন্তু যাকে সে আবৃত করে নিজের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত করতো সেও তো এখন তারই মতো টিকে থাকার যুদ্ধে বিপর্যস্ত।

*নিউ ইস্কাটন, ঢাকা থেকে*

## অপমানিত

– অনামিকা

২৬ জুলাই, ১৯৯৮ সাল। আমার জন্মদিন। আর্থিক সমস্যা এবং ইসলাম ধর্ম মতে উৎসব করা শিরক বলে আমার পরিবারে কখনো কারো জন্মদিন ঘটা করে পালন করা হয় না। যাহোক, যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো রাজশাহী ইউনিভার্সিটির হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আলতাফ। তার সঙ্গে আমার অদ্ভুত এক সম্পর্ক ছিল। প্রেম, ভালোবাসা নাকি অন্য কিছু তা জানতাম না। কারণ তার প্রতি আমি কোনো টান অনুভব করতাম না। তাকে দেখার জন্য মন ছটফট করতো না। সে অসুস্থ হয়ে কিংবা তার ছোটখাটো কোনো ক্ষতি হলে আমার খারাপ লাগতো না। তবে সে যখনি আমাকে ডাকতো তখনি আমি যেভাবে পারতাম তার সঙ্গে দেখা করতাম।

সেদিনও আলতাফ আমাকে ডাকলো। গেলাম। সারাদিন এক সঙ্গে কাটালাম। তাকে প্রীতমে খাওয়ালাম। শাড়ি কেনার জন্য দোকানে গেলাম। সবাই বলে, পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকলে মেয়েদেরকে দোকান, রেস্টুরেন্ট বা রিকশা ভাড়া দিতে হয় না। তাহলে নাকি পুরুষ জাতকে অপমান করা হয়। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা উচিত যে, আলতাফের দেয়া কোনো কিছু আমি নিইনি। সাময়িকভাবে নিলেও পরবর্তী কালে তার দামটা ফেরত দিই। কেন নিই না সেটা অপ্রকাশিত থাক। কারণ সেটা প্রকাশ করে তাকে ছোট করতে চাই না। দোকানে তাকে অপমানিত করতে চাই না বলে জীবনের প্রথম এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি শাড়ি কিনলাম। আপাতদৃষ্টিতে আলতাফ সেটা আমাকে কিনে গিফট হিসেবে দিল। পরে সেই শাড়ির টাকা তাকে ফেরত দিয়েছিলাম।

ধীরে ধীরে আলতাফের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই জানলো। শুধু জানলো না শাড়িটার মূল্য ফেরত দিয়েছি। শাড়িটা যখন পরতাম তখন সমাজের কিছু নিকৃষ্ট মানুষ আমার দিকে বাকা চোখে তাকাতো আর মুখ টিপে হেসে উপহাস করতো। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করতো। আমার প্রিয় শাড়ি, জীবনের প্রথম শাড়ি পরতে না পারার কষ্টটাও আমাকে তাড়া করতো। এখন আমার বেশ কয়েকটা শাড়ি হয়েছে। প্রিয় শাড়িও আছে। কিন্তু সেই শাড়িটার প্রতি দুর্বলতা রয়ে গেছে। এটা পরলে যেমন সমাজের বিষকাটা আমাকে কষ্ট দেয় তেমনি পরতে না পারার কষ্টটাও অসহ্য লাগে। আমি ছাত্রী। বাবা যে হাত খরচ দিতেন তা থেকে কিছু জমাতাম। রিকশা ভাড়া বাচিয়ে পায়ে হেটে, কষ্ট করে যেতাম। টিফিন না খেয়ে সে টাকা রাখতাম। এভাবে প্রতিদিন তিল তিল কষ্ট করে টাকা জমিয়ে সে টাকায় কেনা শাড়ি। আমার সব কষ্ট, পরিশ্রম সেই শাড়িটার মধ্যে রয়েছে। আব্বার কাছে চাইলে শাড়িটা কিনে দিতেন। কিন্তু চেয়েছিলাম আমার নিজের টাকায় শাড়িটা কিনতে। ফল পেলাম উল্টো।

সেদিনের পর থেকে আলতাফের দেয়া কোনো গিফট নিই না। এমনকি তার টাকায় বাদামও খাই না। এতে তার বন্ধুরা আমাকে ভুল বোঝে, অপমানজনক মন্তব্য করে। কেন যে এমন করি সেটা কেউ বিস্তারিত জানে না। আলতাফও কাউকে কিছু বলে না। কারণ এতে সে ছোট হয়ে যাবে। আজ নিজে হীনম্মন্যতায় ভুগি এই ভেবে যে, জানতাম আলতাফ অন্য ধরনের ছেলে। জানা সত্ত্বেও কেন সেদিন টাকাটা দোকানেই বের করে দিলাম না।

এখন আলতাফের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, দেখা-সাক্ষাৎও হয় না। এরপরও আমি আমার প্রিয় শাড়িটা নিয়ে কষ্ট আর হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পাই না। যাকে দোকানের কয়েকজন কর্মচারীর সামনে অপমানিত হতে দিলাম না সেই আমাকে গোটা সমাজের কাছে অপমানিত আর লজ্জিত করে রাখলো। জীবনের প্রথম শাড়ি নিয়ে এমন কষ্টের অভিজ্ঞতা কারো আছে কি না আমার জানা নেই।

*নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে*

# অসাধ্য সাধন

–প্রিন্স আহমেদ রিপন

রুমা আমার প্রেমিকা। অনেক দিন ধরে রুমার সঙ্গে প্রেম করে আসছি। এখন অনেকটা হাপিয়ে উঠেছি বলা যায়। তবে ইদানীং রুমার সঙ্গে একটু ঢিসুম ঢিসুম হচ্ছে। আপনারা আমাকে মেয়ে বলুন আর যাই করুন, শাড়ি আমার খুব প্রিয় যদিও আমি পরি না। তবে রুমাকেও কোনোদিন পরাতে পারিনি। অনেক অনুরোধ করেছি, অনেক রাগ করেছি, কোনো ফল হয়নি। বরং ততোবার রুমার কাছে নিজেই মদন হয়েছি। কেন যে বিধাতা তার মনটা এমন বাবলা কাঠের মতো তৈরি করেছে?

একদিন উপশহর পার্কে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম কেউ আছে কি না। তারপর তার হাত দুটো ধরলাম। বললাম, রুমা প্লিজ! তুমি অন্তত একদিন শাড়ি পরে আমাকে দেখাও।

না, পারবো না, এসব শাড়ি–টাড়ি আমাকে দিয়ে হবে না।

রুমা তোমাকে খুব দামি একটা শাড়ি গিফট দেবো।

না সোনা, শাড়ি গিফট দিতে হবে না। পারলে একটা স্কিনটাইট প্যান্ট ও গেঞ্জি গিফট দিও, খুব খুশি হবো। আর শাড়ি যদি তোমার এতোই প্রিয় হয় তাহলে তুমিই পরে বেড়াও।

কেন? আমি শাড়ি পরতে যাবো কেন?

কারণ তুমি তো মেয়েমানুষ। শাড়ি যার খুব পছন্দ সে মেয়ে ছাড়া কি? আমি এতো সুন্দর সুন্দর পোশাক পরি, তোমার পছন্দ হয় না?

আমি কখনো বলেছি, পছন্দ হয় না? তবে শাড়ি পরলে ভালো লাগতো।

তুমি পরে বেড়াও ভালো লাগবে।

রুমা মনে হয় তুমি ছেলে। কারণ শাড়ি তোমার একদম সহ্য হয় না। এছাড়া প্যান্ট–গেঞ্জি তোমার এতো পছন্দ কেন?

কি বললে? আমি ছেলে! দাড়াও, আজ তোমাকে দেখিয়েই ছাড়বো আমি ছেলে কি মেয়ে।

এরপর রুমা রাগে তার জামা উচু করলো। তারপর তার পাজামার ফিতা খুলতে শুরু করলো।

সে খুব জেদি মেয়ে। শেষমেষ কি করে বসে। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, থাক থাক খুলতে হবে না। আমি জানি তুমি মেয়ে। এমনি ঠাট্টা করলাম।

রুমা এবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা বিশেষ ভঙ্গি করে বললো, বুদ্ধু।

আমি হাসতে হাসতে তার সঙ্গে চলে এলাম। আমরা দুজনেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়তাম। একদিন কলেজের বারান্দায় গল্প করছি। তখন সে আমাকে কমনরুমে ডাকলো। গিয়ে দেখি রুম ফাকা। সে একা বসে আছে। তার পাশে একটা চেয়ারে বসলাম। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। এক সময় আমি বললাম, তাহলে তুমি কোনোদিন শাড়ি পরবে না?

না।

তাহলে আর কি করবো, কখনো বলবো না।

আচ্ছা, শাড়ি পরলে আমাকে দেখে তুমি খুশি হবে?

হবো মানে, বলা যায় তৃপ্তি পাবো।

দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কেন? দরজা বন্ধ করবো কেন?

আমার পোশাকহীন উলঙ্গ শরীরটা একবার দেখো। শাড়ি পরার চেয়ে ভালো দেখাবে। খুব বেশি তৃপ্তি পাবে।

এ কথা শোনার পর কোনো কথা বললাম না। রুম থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। রুমাকে আর কখনো শাড়ি পরার কথা বলিনি। কলেজ থেকে পাস করার পর বিসিএস পরীক্ষার জন্য ঢাকায় গেলাম। পূলিমিনারি পরীক্ষা দিয়ে চান্সও পেলাম। শুরু করলাম লেখাপড়া। অনেক দিন রুমার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না। তাকে ছাড়া একা কিছু ভালো লাগে না। ভাবলাম, এবার গিয়ে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসবো।

পরীক্ষা চলছে। হঠাৎ রুমার একটা চিঠি পেলাম। লেখা আছে, *তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।*

আমার পরীক্ষা চলছিল। তাই সময় মতো যেতে পারিনি। পরে গিয়ে শুনলাম, এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে রুমার বিয়ে হয়ে গেছে।

চোখে পানি এসে গেছে। সব কিছু ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি। এ রঙবিহীন কষ্ট কাকে দেখাবো? এখন বুঝি, রুমা আমাকে কেন আসতে বলেছিল। হায়রে ভাগ্য আমার। যাকে নিয়ে আমার সমস্ত স্বপ্ন সে আজ অন্যের ঘরের ঘরনী।

প্রশাসনে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। চাকরি করিনি। কার জন্য করবো! যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম সে তো নেই, তাই আমার কোনো ভবিষ্যৎও নেই।

এখন কিছু ভালো লাগে না। সারাদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াই।

একদিন উপশহর পার্কে একা বসে আছি। নীল আকাশ দেখছি। বিশাল আকাশ। তার মনে কোনো দুঃখ নেই। মাঝে মাঝে আকাশেরও মনে দুঃখ হয়। তখন কালো হয়, তারপর কাদে। তার চোখের পানিতে সব কিছু ভিজে যায়। দূরে একজোড়া নারী পুরুষ দেখতে পাচ্ছি। শাড়ি পরা সুন্দর একটা মেয়ে। খুব সুন্দর করে শাড়ি পরেছে। মেয়েটার মুখে চোখ পড়তেই বুকের ভেতর ছ্যাৎ করে উঠলো। এ আর কেউ নয়, আমার অনেক দিনের চেনা সেই রুমা। সে আজ শাড়ি পরেছে। সঙ্গের লোকটা নিশ্চয় তার স্বামী হবে।

আমার সারা জীবনের শখ রুমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখবো। আজ সেটা পূর্ণ হলো। রুমার স্বামী লোকটা কি জাদু জানে? কোনোদিন যাকে শাড়ি পরাতে পারিনি সেই রুমা আজ শাড়ি পরেছে এই লোকটার জন্য। হঠাৎ লোকটা রুমাকে হাত ধরে কাছে টানলো তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে...।

আমি চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। বুকের ভেতর কেমন যেন লাগছে। হয়তো আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। দাড়িয়ে হাটা শুরু করলাম।

রাস্তার এক পাশে ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাটছি। এখন কোথায় যাবো, কি করবো, কোথায় বসবো নিজেও জানি না।

*যশোর থেকে*

# দুঃখ

– ওবায়দুল কবীর নান্না

২০০১ সালের রমজান মাসের কথা। আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোর্শেদ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল কিছু কেনাকাটার জন্য। কারণ সে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রবাসের এই সুন্দর চাকরি ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, দেশে গিয়ে ব্যবসা করবে।

নিয়োগকৃত সংস্থার ডিউটি আট ঘণ্টা করার পরেও এখানকার একটা সুপারমার্কেট জুতার শোরুমে পার্ট টাইম কাজ করতো সেলসম্যান হিসেবে। এ জন্যই তার সময়ের বড় অভাব ছিল। তাই আমাকে কেনাকাটা করতে হয়েছিল। অনেক জিনিসপত্র কিনেছিলাম।

তবে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে কিনেছিলাম সুতার কারুকার্যময় দুটো শাড়ি। এখানকার ভারতীয় একটি শাড়ির শোরুম থেকে তুলনামূলক কম দামে কিনেছিলাম।

২০০২ সালের ১২ জানুয়ারি আমার বন্ধু মোর্শেদের দেশে যাওয়া কনফার্মড হয়ে গেল। তার যাওয়ার দিন অফিস থেকে ছুটি নিলাম। যথাসময়ে আমরা এয়ারপোর্টে পৌছে গেলাম। কিন্তু মস্তবড় সমস্যা দেখা গেল মালপত্র বুকিং দিতে গিয়ে। কারণ কুয়েত এয়ারওয়েজের নিয়ম অনুযায়ী মাত্র চল্লিশ কেজি মালপত্র নেয়া যায়।

তাই বাধ্য হয়ে অন্য লোকের পাসপোর্টে অনেক টাকা গচ্চা দিয়ে মালপত্র বুকিং দিতে হলো। আমার বন্ধু যথারীতি বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমিও বাসায় ফিরে এলাম।

এক সপ্তাহ পর সংবাদ পেলাম, তার নতুন মালপত্র যে লাগেজে ছিল সেটা বাংলাদেশ বিমানবন্দরে গিয়ে পায়নি। চুরি হয়ে গেছে। আর আমার পছন্দের কেনা সেই সুন্দর শাড়ি দুটি সেই লাগেজের মধ্যেই ছিল। এই সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেলাম।

ইনশাআল্লাহ আগামী রমজানে ছুটিতে দেশে যাবো। তাই ভেবেছি প্রিয় বন্ধুর দুঃখটা কিছু লাঘবের জন্য সেই রকম দুটো শাড়ি কিনে নিয়ে যাবো তার বৌ–এর জন্য।

আমার যেতে মাত্র আর কয়েক মাস বাকি। অনেক ভালো ভালো মার্কেটে খুজে বেড়াচ্ছি ঠিক সেই রকম দুটো শাড়ি। অথচ পাচ্ছি না। আদৌ পাবো কি না জানি না।

এটাও বড় দুঃখ।

*কুয়েত থেকে*

# দাগ

– অলিউর রহমান ফিরোজ

গভীর রাত। ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ টেলিফোনের জোরালো শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। টেলিফোন রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো। বললো, আপনার সঙ্গে গল্প করবো।

অনেক রাত। তার উপর মেয়েলি কণ্ঠ। সব মিলিয়ে আমি তো একেবারে হতবাক। বললাম, আপনি কে? আর আমার সঙ্গেই বা আপনি গল্প করতে চাচ্ছেন কেন?

সে বললো, বেচে থাকার জন্য আপনাকে আমার বেশ দরকার।

এভাবেই তার সঙ্গে আমার কথা হয়। পরিচয় ঘটে।

জীবন চলার পথে জড়িয়ে পড়ি তার সঙ্গে। শুধু তার আর আমার সঙ্গে পার্থক্য হলো, সে বিবাহিতা এবং আমি অবিবাহিত। প্রতি রাতেই তার সঙ্গে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়। কখনো বা কথা বলতে বলতে রাত শেষ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তার প্রতি খুব দুর্বল হয়ে পড়ি।

তার কথা থেকে জানতে পারি সে ভীষণ একা। স্বামী–স্ত্রী একই ছাদের নিচে থেকেও সম্পূর্ণ সে আলাদা। দুজনে আলাদা রুমে ঘুমায়। স্বামী অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত। কাজের মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আর এটাই সে মেনে নিতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে ডিভোর্স করেনি। তাই একই ঘরে আলাদা জীবন।

এ সুযোগটিই আমাকে নিয়ে যায় অন্য জগতে। তার সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকি। এক সমুদ্র ভালোবাসার মাঝে ডুবে যাই। এরই মধ্য একটি বছর শেষ হয়। সমাজের ভয়ে আড়ালে চলতে থাকে আমাদের দুজনের এ গোপন অভিসার।

স্বামী ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে তাকে বাইরে যেতে হয়। এ সুযোগেই আমরা নিয়মিত মেলামেশা করতে থাকি। গভীর সমুদ্রে পড়লে কয়েকটা খড়–কুটো পেলে আকড়ে ধরে যেমন মানুষ বাচতে চায় ঠিক তেমনি আমাকে পেয়ে জড়িয়ে যেন তার বাচার পথ সে খুজে পেয়েছে।

এখন আমাকে ঘিরেই তার যেন নবজীবন। হাসি–কান্না, আনন্দ–বেদনা সব কিছুই এখন আমাকে ঘিরে। এক মুহূর্তও তাকে ছাড়া চলতে পারি না। নিয়তির অমোঘ মায়াজালের বাধনে দুটি আত্মাই জড়িয়ে পড়েছে। পাপ–পুণ্যের হিসাব এখন আর আমার খেয়ালে জমা নেই। কখনো সে যদি আমার আড়াল হয় তাহলে বুকের ভেতর রক্ত জমাট হয়ে পড়ে। বুক যেন ফেটে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যায়। জানি না এর শেষ কোথায়।

আমরা একে অপরের আঙটি বদল করে আবদ্ধ হয়েছি। এরপরও ইচ্ছা করলেই তাকে পাচ্ছি না। তার সামাজিকতা, সংসার, ছেলেমেয়ে এ বিষয়গুলোর কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।

তাই অনেক ভেবে–চিন্তে দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা একটা সন্তান নেবো। আর এটিই হবে আমাদের সারা জীবনের স্মৃতি।

একদিন তার স্বামী ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে। রাতে ফিরবে না। সে রাতেই শুরু হয় আমাদের অপরিকল্পিত বাসর। রাত গভীর হয়। আস্তে করে তার ঘরে টোকা মারি। সে দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। এ রাতে সে অনেকক্ষণ ধরে আমার বুকে মাথা রেখে কাটায়। এরপর আসে কাঙ্ক্ষিত সে মুহূর্তটি। তাকে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে নিই। শরীরের রক্ত টগবগে হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড ঝড় হয় দুটো শরীর জুড়ে।

শরীর থেকে সে তার শাড়িটা আলাদা করে রেখেছিল। হঠাৎ শাড়িটি হাতে নিয়ে দুজনের মিলিত হবার কিছু রক্ত মাখিয়ে নিয়ে সে বললো, প্রমাণ রেখে দিলাম।

পরে আমাদের ব্যাপারটি তার স্বামীর কাছ থেকে সে জায়েজ করে নিয়েছে। সে আলাদা থাকলে তার স্বামীর প্রয়োজনে মাঝে মাঝে তাকে কাছে ডাকতো। যখন বুঝতে পারলো তার গর্ভে আমারই সন্তান তখনই তাকে জায়েজ করে নিয়েছে।

আমার সন্তানটি এখন হাটতে পারে। ফুটফুটে একটি মেয়ে। আমার পছন্দ অনুযায়ীই তার নাম অরণি রেখেছে। আজ আমার বুকের ভেতর আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমার রক্ত যার ভেতর প্রবাহিত হচ্ছে সেই ছোট্টমণিকে আমি ইচ্ছা করলেই বুকে টেনে নিতে পারি না।

শুধু ভাবি, আমাদের মিলনের কোনটা বড় প্রমাণ?

অরণি, নাকি দাগ?

*মুন্সিগঞ্জ থেকে*

## ড্রাইভার মানুষ

– এমএ হক

মা অসুস্থ। বাড়ি থেকে ফোন পেলাম। রাতে বাসায় এসে প্রিয়তমাকে বললাম, হ্যালো শুনেছো –

বললো, কি ঝটপট বলে ফেলো, আমি একটু ব্যস্ত আছি।

মা অসুস্থ ,বৃহস্পতিবার বাড়ি যাওয়া দরকার, মাকে দেখে আসি।

স্ত্রী বললো, প্রায় এক বছর হয় গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আমিও যাবো, কয়েকদিন থেকে আসবো।

তারপর আমতা আমতা করে বললো, একটা শাড়ি কেনার দরকার।

বললাম, অনেকগুলো শাড়ি আছে, এখন নতুন শাড়ির প্রয়োজন নেই। এমন কোনো অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না যে নতুন শাড়ি লাগবে।

এক কথা, দুই কথায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সুন্দর মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। আমি চুপ হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম হয়তো এখনিই বর্ষণ হবে।

সকালে নাশতা সেরে তেমন বেশি কথা বললাম না। দোকানে চলে গেলাম। বিকেলের দিকে রিকশায় চেপে দোকানের সামনে আসতেই কর্মচারী ইঙ্গিতে আমাকে বললো, ম্যাডাম এসেছেন। আড়চোখে দেখি বাচ্চাটার হাত ধরে রিকশা থেকে নামছে। আগে কিছু বলা ছাড়াই হঠাৎ গিন্নির আগমন। বাসায় কিছু হলো নাকি! দোকানের ভেতর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো?

দেখেও না দেখার ভান করে বললাম, ভালো। মুখে হাসির ঝলক, বুঝতে পারলাম বৈশাখের কালো মেঘ সরে গেছে। সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে। ক্যাশ কাউন্টারের পাশে বসে মিট মিট করে বললো, গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আর একদিন বাকি। আজকে একটু অবসর আছি। তোমার ও বাচ্চার জন্য কাপড় কিনতে হবে। কিন্তু নিজের শাড়ির কথা কিছুই বললো না।

দেখো, এখন কাস্টমারের ভিড় দুইজন কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হাত ধরে বললো, অসুবিধা হবে না।

অগত্যা কোনো উপায় না দেখে রিকশা দিয়ে নিউ মার্কেট নামলাম।

গিন্নি হন হন করে শাড়ির দোকানে ঢুকলো। আমি ছেলেটার হাত ধরে পেছনে পেছনে অনুসরণ করলাম।

দোকানের কর্মচারী বললো, *আফা, কি ছারি লইবেন। আপনে যে ধরনের ছারি লইবার চান, ছব ধরনের ছারি আসে।*

মহাজন গদি থেকে ডেকে বললো, *আবে পিচ্ছি, দুইটা কোল্ড ডিং লই আয় আফারে খিলাইবার লাইগা। সাতে কিছু বিস্কুট বি লইয়া আইছ।*

এই ফাকে অনেকগুলো শাড়ি গিন্নির সামনে। অনেক দেখার পর একটি শাড়ি পছন্দ হলো। কর্মচারী বললো, এক হাজার সাতশ টাকা।

এক হাজার সাতশ টাকার কথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মনে মনে চিন্তা করলাম, মেয়েরা আবেগপ্রবণ, হঠাৎ *দাম কতো* বলে ফেলে। তাই এক বাদ দিয়ে বললাম, সাতশ টাকা।

অন্য পাশ থেকে আরেক কর্মচারী বললো, *আন্নে হতরোশ টেয়ার শাড়ি কেন্নে কহেন হাতশ টেয়া। হতরোশ টেয়া দিয়া কোনদিন শাড়ি কিনছেননি। আন্নে গাড়ি চালান। গাড়ির খবর জাইনবেন।*

আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম, এ কি বলে? আমি গাড়ি চালাই?

দুর্ভাগ্য, গিন্নিও শাড়ি দেখছে, দামাদামি হচ্ছে। দেখিয়ে বলতে পারতো। এই যে দেখোতো শাড়িটা কেমন হবে অথবা দেখোতো অনেক দাম চাচ্ছে। কর্মচারী মনে করলো লুঙ্গি পরা শাদাশিধা পোশাক। ড্রাইভার মানুষ হবে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত নয়শ টাকায় কেনা হলো।

রিকশায় বসে তেমন কথা বললাম না। মনে মনে খুব রাগ হলো। শাড়ির জন্য দোকানের কর্মচারীর এতো কথা শুনতে হলো। আমি দোকানের সামনে নেমে গেলাম। গিন্নি বাসায় গেল।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাসায় গেলাম। দরজা নক করতেই গিন্নি দরজা খুলে দিয়ে হাসি দিয়ে বললো, কি ব্যাপার, আজকে এতো দেরি করলে কেন? তোমার জন্য আমিও অপেক্ষায় আছি। তোয়ালেটা হাতে দিয়ে বললো, হাত মুখ ধুয়ে এসো। এক সঙ্গে খাবো।

আমার কাছে মনে হলো কাটা ঘায়ে লবণের ছিটার মতো। রাগের সুরে বললাম, ড্রাইভার মানুষ কখনো কি ঠিক টাইমে আসতে পারে?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কি হয়েছে?

কেন, শোনোনি দোকানের কর্মচারী কি বলেছে? আমি নাকি তোমার ড্রাইভার?

তাতে কি হয়েছে? এতো বছর তোমাকে ড্রাইভ করলাম, এখন বাকি আছে তোমার গাড়ি। গিন্নি হেসে বললো।

আলতো একটি চুমু দিয়ে বললাম, আজ খাওয়া–দাওয়ার দরকার নেই। তোমার শাড়ি বুকে রেখে আজ ঘুমোবো।

*গুণবতী, কুমিল্লা থেকে*

## পুনর্জন্ম

– মনির আহমেদ

শাড়ি মহিলাদের অতি প্রিয় পোশাক। রাতে স্ত্রীর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। সে আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, জানো, মার্কেটে নতুন মডেলের শাড়ি এসেছে। পাশের বাসার আপা একটা

কিনেছে। আমাকেও একটা কিনে দিতে হবে। আর আপনি হয়তো বলেছেন মাস শেষে বেতন পেলে দেখা যাবে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল নাকানি মানে নাকের কান্না।

বুক থেকে আপনার মাথা সরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে মুখ করে শোবে। তোমার সংসারে এসে আমি কিছুই পেলাম না। শাড়ি দেয়ার মুরোদ নেই তো বিয়ে কেন করেছো? আমাকে চাকরাণীর মতো রাখতে চাও। উলঙ্গ থাকবো দেখুক লোকে।

অথচ দেখবেন তার ওয়ারড্রবে কয়েক জোড়া শাড়ি অব্যবহৃত পড়ে আছে। মাস শেষের অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয়। আপনি যদি বাম হাতের ইনকাম দিয়ে অথবা ধার করে পরের দিনই কাঙ্ক্ষিত শাড়িটা এনে দেন তাহলে দেখবেন তার মুখ থেকে ভালোবাসার স্রোতধারা বইছে।

মহিলারা আড্ডায় বসেছে। আড্ডার বিষয় শাড়ি। বাহ! ভাবী আপনার শাড়ি তো বেশ সুন্দর। কোন দোকান থেকে কিনেছেন? দামটা জানি কতো হয়েছে?

শাড়ি পরার স্টাইল দেখে আপনি বুঝতে পারবেন এটা গ্রামের আনাড়ি মেয়ে, না শহরের আধুনিকা। আবার পরনের শাড়ি দেখে বুঝতে পারবেন ওনার স্বামী ব্যবসায়ী, নাকি চাকরিজীবী। শাড়ির সবচেয়ে বড় ব্যবহার মহিলাদের ইজ্জত, আব্রু রক্ষা করা। শাড়ি পুরনো হয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। সুতি শাড়িকে রঙিন সুতা দিয়ে নকশী কাথা বানিয়ে ফেলুন আর সিল্ক শাড়ি দিয়ে দরজা জানালার পর্দা বানিয়ে ফেলুন। এগুলো না করতে পারলে আশপাশে অনেক গরিব বাস্তুহারা মহিলা আছে তাদেরকে দান করে দিন। সওয়াব পাবেন।

শাড়ি ছিড়ে গেলে টুকরো করে গরম পাতিল ধরার কাজে লাগান। আবার কেউ কেউ শাড়ির অপব্যবহারও করেন। যেমন গলায় শাড়ির আচল পেচিয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়েন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শাড়ি মহিলাদের মর্যাদা বাড়ায় আবার অনেক বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়।

আমার বন্ধুর কাছ থেকে শোনা গল্প বলছি। আমার বন্ধুর এক বড়ভাই শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গেছেন। বাড়িতে ঢুকতেই দেখেন ওনার স্ত্রী উপুড় হয়ে উঠান ঝাড়ু দিচ্ছেন। তিনি চুপচাপ পেছন গিয়ে মজা করার জন্য পাছার ওপর হাত রেখে দিলেন জোরে চাপ। চাপ দিতেই দেখেন ওনার স্ত্রী নন, এটা ওনার শাশুড়ি। ওই দিন শাশুড়ি শখ করে ওনার স্ত্রীর শাড়ি পরেছিলেন।

শাড়ি উপহার দিলে অখুশি হন এই রকম মহিলা পাওয়া দুষ্কর। আজই প্রিয়জনকে অথবা গৃহিনীকে একটা শাড়ি উপহার দেন। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে বিরোধী দলের নেত্রী ছাড়া। তিনি হয়তো ভেবেছেন নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া শাড়ি পরে রাস্তায় বের হলে জনতা গেয়ে উঠবে,

*এই তো হেটে যায়*
*ফিরে নাহি চায়*
*খালেদা জিয়ার শাড়ি পরে*
*হাসিনা হেটে যায়।*

পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি না। এরপরও কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে পুনর্জন্মে তুমি কি হয়ে জন্মাতে চাও? তাহলে বলবো, পুনর্জন্মে যেন লাল বেনারসি শাড়ি হয়ে জন্মাই। কারণ এটাই নববধূর প্রিয় শাড়ি।

*সউদি আরব থেকে*

# ঋণী

– শওকত

প্রায় পাচ বছর ধরে দুবাইতে আছি। নেসলে কম্পানিতে সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। আকরাম আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু দুবাই–তে। ছেলেটি ইনডিয়ান, জন্ম কলকাতাতে। তাই বেশ ভালো শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে। আকরামদের পরিবারের সঙ্গে সাবলেট হিসেবে থাকি অনেক দিন থেকে।

যে ফ্ল্যাটে থাকতাম তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকতো একটি বাঙালি পরিবার। খুবই ছোট পরিবার। শুধু স্বামী আর স্ত্রী। ভদ্রলোকের বাড়ি চট্টগ্রামে। আমিও চট্টগ্রামের ছেলে হওয়াতে তার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে ওঠে। এদিকে শারমিন ভাবী অর্থাৎ ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে আকরামের মায়ের বেশ ভাব। অনেকটা নিজের মেয়ের মতো পছন্দ করতেন। সেই হিসেবে সব সময় বাসাতে আসা–যাওয়া করতো। এতে করে আমারও মাঝে মধ্যে ভাবীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হতো। ভাবী দেখতে বেশ সুন্দর, দারুণ ফিগার, আকর্ষণীয় চেহারা এবং গায়ের রঙ দৃষ্টি কাড়া।

একদিন আমার কেমন যেন সকাল থেকেই শরীর ভালো লাগছিল না। তাই আর অফিসে যাইনি। দুপুরে লাঞ্চ সেরে বারান্দায় বসে বই পড়ছিলাম। দরজা খোলা ছিল, ভাবীদের দরজাও আজ খোলা। দেখলাম ভাবী বারান্দাতে বসে রোদের আলোতে চুল ঝাড়ছেন। ভাবীর পরনে ছিল একটি গাঢ় গোলাপি রঙের শাড়ি। অপূর্ব রকমের সুন্দর লাগছিল ভাবীকে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে ভাবীর পেছনে গিয়ে ভাবীকে চমকে দিলাম।

পেছনে ফিরে ভাবী দেখলেন আমি। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, আজ অফিসে যাননি!

বললাম, শরীর ভালো নেই, তাই যাইনি। ভাবী, আপনাকে বেশ সুন্দর লাগছে নতুন শাড়িটিতে। হঠাৎ নতুন শাড়ি পরলেন, এনিথিং স্পেশাল?

ভাবী বললেন, আজ আমার ম্যারেজ ডে। গত ম্যারেজ ডে–তে তোমার ভাইয়া শখ করে শাড়িটি গিফট করেছিলেন। তাই আজ আবার পরলাম।

শাড়িটার প্রতি আমার আকর্ষণ কেমন যেন বেড়ে যেতে লাগলো। আসলে রঙটায় আমার বেশ পছন্দের। তাই কিছুটা কৌতূহলী হয়ে ভাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার শাড়িটি সিল্কের নাকি?

অমনিই ভাবী আচলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখুন না।

আচলটা হাতে নিয়ে ভালোভাবে দেখতে লাগলাম। এমন সময় লক্ষ্য করলাম, ভাবী তার বুকের ওপর থেকে কাপড়টা আস্তে করে নিচে সরিয়ে দিলেন। এতে করে বুকের ওপরের অংশ একেবারে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। দৃষ্টি আমার আর সরতে চায় না। নিজের অজান্তে আমার দুষ্ট হাত চলে যায় বুকের ওপর। পিপড়ার মতো পিলপিল করে হাটাতে লাগলাম হাতকে, হয়তো ভাবী তখন বেশ মজা পাচ্ছিলেন। এতেই এক হাতে আচল দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে তার শরীরের সঙ্গে টেনে নিলেন। অপর হাতে দেখলাম ধীরে ধীরে ব্লাউজের বোতাম খুলে দিলেন।

ভাবীর সম্মতি দেখে আমিও দুই হাত দিয়ে ব্রা–র হুকগুলো এক এক করে খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো সতেজ স্তনযুগল। খালি আকাশের মতো ধবধবে সুন্দর অবস্থা। পৃথিবীতে এর চেয়ে

সুন্দর আর কি হাতে পারে! থাক, নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে শুরু করলাম মুখ দিয়ে খোলা আকাশের বিচরণ। ভাবীও বেশ সাহায্য করতে লাগলেন। দুজনেই একেবারে উত্তেজিত অবস্থায়। এক সময় বুঝতে পারলাম আমরা সীমা লঙ্ঘন করতে যাচ্ছি। তখন নিজেকে ভাবীর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চাইলাম। বন্ধন মুক্ত করতে গিয়ে আমার ঘড়ির চেইনের সঙ্গে শাড়ি লেগে গিয়ে অনেকটা কেটে যায়। শাড়ি কাটার শব্দ শুনে একদম হতবাক হয়ে গেলাম, এমনকি ভাবীও।

দ্রুত নিজের বাসায় ফিরে যাই। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হলো। আমি জানি, ভাবী বেশ কষ্ট পাবেন। কারণ মেয়েরা সাধারণত শাড়ির মতো বস্ত্রের প্রতি বেশ স্পর্শকাতর যদি সেটা হয় প্রিয় শাড়ি। এই ভেবে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি, হয়তো শাড়িটা ভাবীর বেশ প্রিয় ছিল।

পরে ভাবীকে আমার পছন্দের কেনা একটি শাড়ি গিফট দিই। ভাবী অবশ্য প্রথমে আপত্তি করেছিলেন নিতে। কিন্তু আমি হতাশ হবো ভেবে নিয়ে নিলেন। এতে করে আমারও টেনশন কমে গেল। এর এক মাস পর ছুটি কাটাতে দেশে এসেছিলাম। আসার সময় ভাবী এয়ারপোর্টে এসেছিলেন সেই শাড়িটি পরে আমাকে বিদায় জানাতে। সত্যি সেদিন আমার বেশ ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে সুখী মানুষ। ভাবীকে থ্যাংকস জানাতে চেয়েছিলাম শাড়িটি পরে আসার জন্য। সম্ভব হয়নি সঙ্গে স্বামী থাকাতে।

ছুটি কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম দুবাই-তে। ভেবেছিলাম ভাবীকে ধন্যবাদ দেয়াটা খুব জরুরি। কিন্তু শুনলাম, ভাবী দেশে চলে গেছেন একেবারে। বেশ দুঃখ পেলাম। আমাকে ঋণী করে রেখে গেলেন ভাবী।

*দুবাই থেকে*

## ইন্দ্রজাল

– আরজু

দুই চারজন ভালো ছাত্রের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবো। সে লক্ষ্যেই এগোচ্ছিলাম। এসএসসি ও এইচএসসি-তে ভালো রেজাল্টও করলাম। ঠিক সেই সময় যখন আমার ক্যারিয়ার গড়ার সময়, আটকা পড়লাম ভালোবাসা নামের ইন্দ্রজালে। আমি হলাম পাগল মজনু। পালালাম তার হাত ধরে অজানার উদ্দেশে। উদ্দেশ্য স্বপ্নের বাসর গড়ার। কিন্তু হায়। বিধি বাম, তার বয়স ছিল আঠারো-র নিচে। কতো উকিল, বড় ভাইয়ের কাছে গেলাম, কতো কাজির পা ধরলাম। ফলাফল শূন্য, ফাকা আস্ফালন মাত্র। অতপর মালপানি যা অনেক কষ্টে গুছিয়েছিলাম অনেকটা *দি লাঞ্চ* গল্পের নবীন লেখকের মতো শেষ হলো। ফাকা পকেটে তো আর বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মতো পালিয়ে বেড়ানো যায় না। কি আর করা। বাড়ি ফিরলাম। শুরু হলো গ্রাম্য ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম। বিচারে রায় হলো গার্ডিয়ানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে বিয়ে। গার্ডিয়ানরা যেন এ সুযোগই খুজছিলেন। তারা না দিয়েই রায়কে স্বাগত জানালেন। একবারও আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা ভাবলেন না। রায় যাই হোক না কেন, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের দায়ে আমাদেরকে দেয়া হলো একশ একটা বেত্রাঘাত। সে মেয়ে হওয়ায় বেচে গেল। কিন্তু আমাকে দেয়া হলো জিগার কাচা

ডালের একশ একটা বেত্রাঘাত। বিচার শেষে তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠানো হলো। আর আমি যেন পড়লাম বিরহ নামের হাবিয়া দোজখে। মুক্তির আশায় গিলে ফেললাম পচিশ মিলিগ্রামের দুই পাতা ঘুমের বড়ি। কিন্তু হায়! সময় মতো নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। ডাক্তার সাহেব হাসি মুখে আমার গলায় নল (নল না বলে রড বলাই যুক্তিযুক্ত) ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে পাকস্থলী ওয়াশ করলেন। বেচে গেলাম সে যাত্রা। ইতিমধ্যে অ্যাডমিশনের সময় এলো। কোচিংয়ের জন্য আমাকে ঢাকা পাঠানো হলো। পৃপারেশন কি নেবো, আগের পড়াগুলোই যেন মস্তিষ্ক থেকে আউট হয়ে গেল। বই নিয়ে পড়ার চেয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেই প্রস্তুতি পর্ব কাটিয়ে দিলাম। ফলাফল মেডিকাল তো দূরের কথা, ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতেও চান্স পেলাম না। কি আর করা! লোকাল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স-এ ভর্তি হলাম। সেখানেও মন টিকলো না। পড়াশোনাই বাদ দিলাম।

মজার ব্যাপার, বন্ধুদের সহযোগিতায় সেই তাকেই আবার বিয়ে করেছি। বাড়িতে বাবা ওঠায়নি। টিউশনি করে কোনো রকম দিন কাটাচ্ছি। তাকে বাসর রাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যেদিন অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবো সেদিনই প্রথম শাড়ি লাল বেনারসি কিনে দেবো। সে প্রতীক্ষায় আছে, এখন আর কোনো শাড়ি পরে না। আমাদের বিয়ের দুই বছর হয়েছে। আমার প্রতিশ্রুতি এখনো পালন করতে পারিনি, ব্যর্থ রয়েছি।

আশার কথা, এ বছর আমি বি.কম পরীক্ষা দিয়েছি। হয়তো রেজাল্টও ভালো হবে। হয়তো লাল বেনারসিও কিনতে পারবো। কিন্তু আমার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল। তাই প্রিয় যাযাদির মাধ্যমে তরুণ সমাজের প্রতি আমার মিনতি, ছাত্র অবস্থায় কারো শাড়ি কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'ভালোবাসার ইন্দ্রজালে' জড়াবেন না।

*রেলওয়ে কলোনি, সিরাজগঞ্জ থেকে*

## বন্ধু

– রোজি সুলতানারা

১৯৯৬ সাল। ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছি। পরীক্ষা থাকলেও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ চলতো নিয়মিত। এমনি একদিন আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাসায় গেলাম। বন্ধুটি আমার চেয়ে বয়সে ছিল বড়। তবুও কি করে যেন দুজন দুজনার অসম অথচ ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। সেদিন আমার পরনে ছিল হালকা আকাশি রঙ-এর একটি শাড়ি। এর আগে সে কখনো আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখেনি।

আমি যখন তার বাসার ড্রইং রুমে বসে গল্প করছি, হাত-পা নেড়ে কথা বলছি তখনো সে অবাক চোখে আমাকে দেখছিল।

কথার মাঝে হঠাৎ বললো, আমার সঙ্গে একটু বাইরে যাবে?

কোথায়? প্রশ্ন করলাম,

বললো, একটু মার্কেটে যাবো।

তাকে মজা দেয়ার কথা ভেবে রাজি হলাম। পাশাপাশি রিকশায় যাচ্ছি হঠাৎ বললো, তোমাকে আজ ভীষণ সুন্দর লাগছে।

আমি হাসলাম। বললাম, মার্কেট কেন যাচ্ছো? বললো, তোমাকে সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে দেবো।

তার কথা শুনে আমি বিব্রতবোধ করলাম। কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সে আমার ভালো একজন বন্ধু, শুধুই বন্ধু। তাছাড়া এভাবে সে কখনোই আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

আমার গম্ভীর মুখ দেখে সে বললো, তুমি যদি মনে করো আমার কাছ থেকে শাড়ি নেয়াটা উচিত হবে না তাহলে নিও না। তবে আমার খুব ইচ্ছে করছে একটা শাড়ি তোমাকে কিনে দিতে।

এরপর বেইলি রোডে গিয়ে সে আমাকে একটা নয়, দুটো শাড়ি কিনে দিল। ফেরার পথে তেমন কোনো কথা হলো না শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল, পরীক্ষাও শেষ। এর মাঝে ওর সঙ্গে বেশ কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে দেখা হয়নি। একদিন ফোন করে দেখা করতে চাইলো। বললো বাসায় না, আমি মগবাজার আড়ংয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম, সেদিনও শাড়ি পরে গিয়েছিলাম। গিয়ে তাকে সেখানে না পেয়ে একা বিরক্ত হচ্ছিলাম। মিনিট পাচ পরে স্কুটারে চড়ে সে এলো। আমাকে দেখে স্কুটারে উঠে আমাকে ইঙ্গিত করলো। স্কুটারে বসে বললো, তোমাকে আজ নৌকাতে চড়াবো।

বুড়িগঙ্গার পাড় ধরে হাটছি আর ওকে বোঝার চেষ্টা করছি। ও যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। এই কিছুক্ষণ আগে ওর আনা চকলেট খাচ্ছিলাম। আমার কাছে ও চকলেট চাইলে একটি চকলেট বের করে দিলাম। কিন্তু সে ওটা না খেয়ে আমার খাওয়া অর্ধেক চকলেট খেয়ে ফেলে একটা দুষ্টু হাসি দিল আমায়। ঘাটে দেখলাম অনেক নৌকা, তার একটাতে চড়ে বসলাম। সূর্যটা কোমল হয়ে উঠেছে। গল্পে মশগুল আমরা। হঠাৎ পাশ দিয়ে ছোট একটি লঞ্চ চলে যাওয়া ঢেউ-এ নৌকাটি প্রচণ্ড দুলতে লাগলো। ও আমার পাশে বসা ছিল। আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার ওপর পড়ে গেলাম। ঢেউ কমে এলে আমি তার বুক থেকে নিজের মাথাটা তোলার চেষ্টা করতেই সে আমাকে বাধা দিল। বললো, থাকো না কিছুক্ষণ এভাবে।

এতোক্ষণ আমি বিভ্রান্ত ছিলাম হঠাৎ করেই যেন আমি পুরোপুরি ওকে জেনে গেলাম। তবুও ফেরার পথে ফাস্ট ফুডের এক দোকানে ধূমায়িত কফির মগ হাতে বললাম, আমাদের সম্পর্কটাকে নিয়ে আমি কনফিউজড।

ও আমার একটি হাত আলতো করে ধরলো বললো, তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

এভাবেই শাড়ি উপহার দেয়া নিয়ে আমাদের ভালোবাসার কথা আমরা বলতে পেরেছিলাম। এরপর কেটে গেল দেড় বছর। অথচ দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব, কলহ, ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমাদের বিয়েটা হচ্ছিল না। দিনের পর দিন আমাদের সম্পর্কটাকে নিয়ে দুই পরিবারের টানা-হেচড়ায় মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এক রাতে আমাদের বাসার ছাদে লুকিয়ে কথা বলছিলাম। রেগে গিয়ে বললাম, ভুলে যাও আমাকে, আমার পক্ষে তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব না।

একথা শোনা মাত্র সে কেদে উঠলো। আমার হাত দুটো ধরে বললো, প্লিজ, এ কথা বলো না, আমরা কালই বিয়ে করবো। কাউকে প্রয়োজন নেই, তুমি এডাল্ট। আমিও প্রতিষ্ঠিত। কোনো সমস্যাই হবে না। প্লিজ তুমি না করো না।

সেদিন তাকে আমি ফেরাতে পারিনি। ঠিক একদিন পর আমরা কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করি। বিয়ের দিন ও আমার জন্য এনেছিল লাল রঙ–এর একটি দামি শাড়ি যা পরে আমাকে সত্যি বৌ–এর মতো লাগছিল। সাজগোজের পর মনে হচ্ছিল বিয়ে বাড়ির নতুন বৌ। এক্ষুণি বিয়ে বাড়ি লোকজনে সমাগম হয়ে উঠবে। কিন্তু তা না হলেও আমরা দুজন খুশি ছিলাম দুজনকে পেয়ে।

এ লেখা লিখছি ২৯ চৈত্র। আর একদিন মাত্র বাকি ১ বৈশাখ–এর। আমার বন্ধু স্বামীটি আমার জন্য বৈশাখের শাড়ি এনেছে। আজো শাড়ি পরলে সে আমাকে আগের মতোই মুগ্ধ চোখে দেখে।

*তেজগাও, ঢাকা থেকে*

## অভাব

– বাবু

আমি তখন খুব ছোট। ক্লাস টু–তে পড়ি। তখন আমরা আট ভাইবোন। বর্তমানে আমরা একই মায়ের দশ ভাইবোন। ভাইদের মধ্যে আমি সবার ছোট। আমার ছোট তিন বোন। উপার্জনক্ষম হিসেবে বাবা একা। তাই এতোগুলো ভাইবোনের লেখাপড়া ও ভাত–কাপড়ের যোগাড় এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। এর উপর সে বছর শিলাবৃষ্টিতে মাঠের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সংসারের এতোগুলো লোকের ভাত যোগানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। সামনে কোরবানির ঈদ। আমরা ছোট তিন ভাইবোন ঈদে নতুন জামা নেয়ার জন্য জেদ ধরলাম। বড়রা অবস্থা দেখে হয়তো কিছু বলেননি। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। তাই আব্বার একটা পেনশন ছিল প্রতি তিন মাস পর এগারোশ টাকা নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হিসেবে পেতেন। তা উঠিয়ে আব্বা আমাদের তিনজনের তিনটি নতুন জামা কিনে আনলেন। আমরা মহা খুশি।

পরদিন সকালে প্রতিবেশী এক চাচি কি যেন নিতে মায়ের কাছে এলেন। চাচি আমাদের পরনে নতুন জামা দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুবু, তোমার ঈদের শাড়িটা কেমন, দেখাবে?

মা বললেন, আমার আবার ঈদের শাড়ি, এক মুঠো ভাত তাই ঠিক মতো জোটে না। এই তো দেখছিস না, এই ছেড়া শাড়িটা পরে কোনোভাবে আছি।

চাচি ভেংচি কেটে বললো, এতো বড় সংসারে তোমার জন্য একটা শাড়িই জোটে না, তার চেয়ে দাসীবান্দিরাই ভালো, বছর অন্তর তাও তো একটা পরনের কাপড় শাড়ি পায়।

মায়ের দুঃখ নিয়ে তারা অনেক কথাই বলাবলি করলো। মায়ের কথাগুলো কেমন আমাকেও কষ্ট দিচ্ছিল। এরপর দুপুরবেলা মা ও আব্বা শাড়ি নিয়ে ঝগড়া লাগলো। পরের দিন ঈদ আর বাজার করার সময়ও নেই। আব্বা ঝগড়া করে কোথায় যেন চলে গেলেন। মা ঘরে বসে কান্না শুরু করলেন। আমি মায়ের কান্না দেখে খুব কষ্ট পেলাম। দেখলাম, আব্বার বৃফকেসটা খোলাই ছিল। সেখান

থেকে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট চুরি করে চুপি চুপি বাজারে চলে গেলাম। এবং দোকানে অন্যান্য লোকের সঙ্গে শাড়ির দাম করতে লাগলাম।

এক দোকানদার আমাকে লক্ষ্য করে বললো, এই পিচ্চি, তোর সঙ্গে কে আছে?

আমি বললাম, কেউ নেই, আমি মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবো।

দোকানদার বললো, কতো টাকা নিয়ে এসেছিস দেখি?

আমি পঞ্চাশ টাকার নোট দেখাতেই ধমক দিয়ে বললো, যা, তোর পঞ্চাশ টাকায় কোনো শাড়ি নেই। অযথা ঝামেলা পাকাসনে।

কোনো দোকানেই পঞ্চাশ টাকার শাড়ি পেলাম না। তাই মন খারাপ করে বাড়ি চলে এলাম। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাড়ির উঠানে পা দিতেই আব্বার বড় বড় কণ্ঠ শুনতে পেলাম, জলদি বের কর কে টাকা নিছিস। বের না হলে রাতে কারো ভাত নেই।

আমি দুরু দুরু বুকে উকি দিয়ে দেখলাম হাতে একটি বেত নিয়ে আব্বা সবাইকে এক লাইনে বারান্দায় দাড় করে ধমক দিচ্ছে আর মা পাশে ছোটবোনকে কোলে নিয়ে বলছেন, খবরদার, কাউকে মারবে না। যে নিয়েছে, এমনি বের করে দেবে।

এই কথা শুনে মায়ের ওপর আব্বা চড়াও হয়ে বললেন, তোমার সাহায্যে সবগুলো মাথায় উঠেছে। এদের শায়েস্তা না করলে হবে না বলে সবাইকে ধমক দিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে বের করে দাও, কিছু বলবো না।

এরপরও কোনো কাজ হলো না। শেষে সময় বেধে দিলেন, পাচ মিনিট সময় বের না হলে এই বেত পিঠে ভাঙবো।

সবাই তো ভয়ে কাপছে।

মা শুধু বলছেন, যে নিয়েছো, বের করে দাও। তাহলে আর কিছু বলবে না।

পাচ মিনিট শেষ হলো। কিন্তু বের হলো না। এরপর বেত পিঠে পড়া শুরু করলো। মা বাচাতে গিয়ে নিজেও দুই তিনটি খেলেন। কোলে ছোট বোনটি ভ্যা ভ্যা করে কাদতে শুরু করলো। কতোক্ষণের মধ্যে এক করুণ ট্র্যাজেডি নাটকের বর্বরতা শুরু হয়ে গেল। আমি আর দাড়িয়ে থাকতে পারলাম না। এক দৌড় দিয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা বললেন, এই শয়তান, তুই এতোক্ষণ কোথায় ছিলি, তোর আব্বার টাকা কে নিছে?

তখনই টাকার নোটটি মায়ের হাতে ধরিয়ে দিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, এই টাকা কি জন্যে নিছিলি?

ভয়ে ভয়ে বললাম, এই টাকা নিয়ে তোমার জন্য শাড়ি কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম।

মা তখন আব্বাকে টাকাটা বাড়িয়ে দিলে বললেন, এই নাও তোমার টাকা। তুমি শাড়ি কিনতে না পারলেও তোমার ছেলে কিনতে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা আব্বা জেনে হো হো করে হেসে উঠলেন। এর সঙ্গে মাও হেসে ফেললেন। এবং সবাই বলতে লাগলো, টাকা চুরি করছে সে, আর মার খাওয়ালো আমাদের। লজ্জায় দৌড় দিয়ে ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

বর্তমানে আমি বড় হয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নাবিক হিসেবে কর্মরত আছি। এখন ছুটিতে বাড়ি গেলেই মায়ের জন্য একটা শাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু আব্বা আজো বছর অন্তর একটা শাড়ি মাকে কিনে দিতে পারেন না। ছোট তিন বোনের যৌতুকের অভাবে বিয়ে হচ্ছে না। বেশি ভাইবোনের জন্য আজও সংসারে সচ্ছলতা আসেনি। গত ছুটির আগে নয় মাস ছুটি না পাওয়ায় মাকে তিন মাস ছেড়া শাড়ি পরতে হয়েছে এবং আব্বা চিঠি লিখেছিলেন, তোর মায়ের শাড়ি নেই। সংসারে খুব অভাব। তাই একটা শাড়ি পার্সেল করে পাঠিয়ে দিস। চিঠিটা পড়ে হতবাক হয়ে মনের অজান্তেই বলতে লাগলাম, হায়রে অভাব! আমার মায়ের জন্য বছরে একটা শাড়িও সংসার থেকে জোটে না।

*চট্টগ্রাম থেকে*

## যত্নে রাখা

– নাজ

এই তো ১৯৯৯ সালের কথা। সবেমাত্র এইচএসসি পাস করে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের দিন গুণছি। এমন সময় একদিন আমার ভাইয়া পরিচয় করিয়ে দেন তার পূর্ব পরিচিত রাজশাহী ইউনিভর্সিটিতে পড়ুয়া তার এক ছোটভাইয়ের সঙ্গে। আমি তার ছদ্ম নাম তপু ব্যবহার করলাম এখানে। আর তাকে নিয়েই আমার গল্প। তপু ছিল খুব ভদ্র, স্মার্ট ছেলে। তার কথা বলার স্টাইলসহ সব কিছু মিলে আমার প্রচণ্ড ভালো লেগে যায়। তারপর থেকে চলতো আমাদের দেখা করা, ঘুরে বেড়ানো।

এক সময় তাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলি। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ না পেয়ে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হই। যেহেতু সে ছিল মাস্টার্সের ছাত্র এবং আমি ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী সেহেতু আমার প্রকাশ ভঙ্গিটা একটু বেশি ছিল। এক সময় আমাদের দুজনের মধ্যে কথাটি জানাজানি হয়ে যায় এবং এক ভদ্র প্রেমের সৃষ্টি হয়। একদিন তাকে কথায় কথায় বলি, তার পড়া শেষ করে যখন চাকরি করবে তখন যেন সে আমাকে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি কিনে দেয়। তখনই সে আমাকে বলেছিল, তুমি কি আমার বৌ যে, তোমাকে লাল শাড়ি কিনে দেবো, এ কথায় খুব মজা পেয়েছিলাম।

একদিন এলো সেই সময়। আমার ধারণা, আমার দোয়ায় হয়তো তপুর পড়া শেষ করা মাত্র পনেরো দিন পরেই একটা ভালো চাকরি হয়ে যায়। এবং প্রায় চার মাস পর আমাদের দেখা হয়। তবে দুঃখের বিষয়, সে আমাকে একটা কালো শাড়ি কিনে দিতে চায়। এ কথায় খুব দুঃখ পেলেও চেপে থাকি বিষয়টি। অবশেষে সে আমাকে একটা সবুজ শাড়ি কিনে দেয়। শাড়িটি তপু আমাকে কিনে দিলেও একটিবারও পরতে বলেনি। আর এটাই আমার দুঃখ। শাড়িটি কোনোদিন পরিনি। যেদিন সে আমাকে আদর করে শাড়িটি পরতে বলবে সেদিনই পরবো। এবং যদি পরতে না বলে তাহলে যেভাবে যত্নে রেখেছি সেভাবেই রেখে দেবো। হয়তো একদিন দেখবো, বয়সের ভারে শাড়িটির জীর্ণ অবস্থা। সেদিনও শাড়িটি খুব যত্নে রাখবো। কারণ শাড়িটি যে আমার প্রিয় মানুষ তপুর দেয়া শাড়ি।

*নবাবগঞ্জ থেকে*

# বেইজ্জতি

– শামীম

রুবেলের দুষ্টুমিটা ক্রমেই বেড়ে চললো। এমনকি সুযোগ পেলে আমাদের থ্রি স্টার গ্রুপকেও সে বেইজ্জত করার চেষ্টা করতো। কলেজে আমি, জিমি এবং রুমেন থ্রি স্টার হিসেবে পরিচিত ছিলাম সব লাইনেই ভালো পারফরমেন্সের জন্য। দুষ্টামি, খেলাধুলা এসব করেও রুমেন ছিল ক্লাসে ফার্স্ট বয়, জিমি ছিল লেডিস হস্টেলে হার্ট থ্রব ইত্যাদি।

একদিন ক্লাস শেষে ক্যান্টিনে আড্ডা দিচ্ছি। রুবেল এসে বললো, জিমি, তোকে একটি মেয়ে ডাকছে।

জিমি উঠে দাড়ালো। দরজার বাইরে দাড়ানো মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার জন্য।

এদিকে চারদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। অনেকেই ব্যাপারটি দেখতে পেয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে যে, বাইরে দাড়িয়ে আছে একজন মহিলা ভিক্ষুক। ছেলেদের অট্টহাসি, মেয়েদের ফিক ফিক হাসি দেখে আমরাও হাসলাম। বেচারা জিমিও রাগ বাদ দিয়ে হাসতে লাগলো।

রাত বারোটায় মিটিং বসলো আমার ঘরে। ওভারস্মার্ট, ওভার কনফিডেন্ট রুবেলকে আমরা চরম বেইজ্জত করবো। আমি পরিকল্পনা করলাম, রুমেন রূপরেখা তৈরি করলো এবং জিমি সহযোগিতা করলো। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, রুবেলকে তার ওভার কনফিডেন্সের পাহাড় থেকে নিচে ছুড়ে ফেলবো। রুবেলেই নিজেকে লজ্জাহীন, বিশ্ববেহায়া সকল কাজের কাজি ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করে সুখ পায়।

দিন যায়, মাস যায় এভাবে প্রায় ছয় মাস পর রুবেলের সঙ্গে আমাদের ভাব এতো জমে উঠলো যে কোনো কাজে আমাদের চারজনকে এক সঙ্গেই দেখা যেতো। আমরা রুবেলের স্বভাবসুলভ চাপাবাজিকে সমর্থনই দিতাম। যদিও অনেকেই ব্যাপারটি পছন্দ করতো না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে রুবেল বললো, দুনিয়ার এমন কোনো কাজ নেই যা সে পারে না।

রুমেন বললো, দুনিয়ার সব কাজ পারলেও তুমি এসএইচ অর্থাৎ লেডিস হস্টেলে মেয়েদের রুমে ঢুকতে পারবে না। বলাবাহুল্য, এসএইচ–এ মেয়েদের রুমে কোনো পুরুষের প্রবেশ ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। রুমেন ঘোষণা করলো রুবেল যদি লেডিস হস্টেলে মেয়েদের রুম থেকে কোন জিনিস চেয়ে বা চুরি করে আনতে পারে তাহলে সে এক হাজার টাকার প্রাইজবন্ড এবং ফৃ চায়নিজ খাওয়াবে।

নিজের প্রেসটিজ বাচাতে রুবেল রাজি হলো। বাজির টাকা ফাকি দেয়া হতে পারে ভেবে ৫০% সে নিয়ে গেল। এর পরের ঘটনা সত্যিই রোমাঞ্চকর।

রুবেলের প্ল্যান শুনে আমরা তাজ্জব হয়ে গেলাম। সে শাড়ি পরে মেয়ে সেজে এলএইচ–এ যাবে তার বান্ধবীর ঘরে যার সঙ্গে তার ইয়ে আছে বলে আমাদের ধারণা। আমরা বিষম খেলাম এই ভেবে যে, বাজির টাকাটা বুঝি গেল। এই সঙ্গে রুবেল আমাদের প্রমিজ করালো ব্যাপারটি যেন আর কারো কানে না যায়।

আমি খালাতো বোনের বাসা থেকে একটি চমৎকার দামি কাতান শাড়ি এনে দিলাম। অবশ্য অনেক কষ্ট হয়েছিল বোনকে বোঝাতে। তুলা দিয়ে বল বানিয়ে এবং টেপ দিয়ে আটকিয়ে ব্রেস্ট তৈরি করা হয়। দোকানের লার্জেস্ট সাইজ ব্রেসিয়ার, ব্লাউজ এবং পেটিকোটে এবং যৎসামান্য কসমেটিকস–এর বদৌলতে ফর্শা চেহারার রুবেলকে সত্যিই নববধূর মতো লাগছিল। আমরা দ্বিতীয়বার বিষম খেলাম।

পূর্বপরিকল্পনা মতো সন্ধ্যার কিছু আগে রুবেলের বান্ধবী তার ঢাকা থেকে আসা খালাকে গেটে রিসিভ করলো। তিনি ভাগ্নির রুমে গেলেন এবং বিশ মিনিট পর ভাগ্নিকে নিয়ে সিড়ি ভেঙে নামতে লাগলেন। মাঝ সিড়িতে তার দুই পায়ের হাইহিলের সঙ্গে শাড়ির প্যাচ লেগে গেল অত্যধিক তাড়াহুড়োতে। তিনি উল্টে গেলেন। তার শাড়ি খুলে গেল। হাইহিল ছিটকে গেল। তিনি ভয়ার্ত গলায় পুরুষ কণ্ঠে, বাবাগো মাগো বলে চেচিয়ে উঠলেন।

আশপাশের মেয়েরা ব্যাপারটা বুঝে গেল। তারা আতঙ্কে চিৎকার করলো, চোর! চোর! দারোয়ান গেট থেকে চিৎকার দিল, ধর! ধর!

পালানোর সময় দেয়ালের ওপর কাটাতারে লেগে শাড়ি তো গেলই, রুবেলের শরীর, হাত–পা ফানা ফানা হলো। তবু প্রাণটা তো বাচলো। যে দারোয়ানকে আমরা বলেছিলাম রুবেলকে হাতেনাতে ধরার জন্য তাকেই আমরা বাধ্য করলাম মুখ না খোলার জন্য। অনেক কাঠখড় পোড়ালাম ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য।

এক সময়ের চাপাবাজ, বাজিবাজ রুবেল এখন খুব ভদ্র, শান্ত। আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডদের মধ্যে একজন। তবে শাড়িকে ভীষণ ভয় পায়। তার সেই প্রিয় বান্ধবী তথা প্রেমিকাকে বলে, খবরদার, শাড়ি পরবে না। বিয়ের পর কোনোদিন শাড়ি চাইবে না।

প্রেমিকাও হেসে বলে, ঠিক আছে, আমি শাড়ি পরবো না। যদি তুমি পরো।

শুনে রুবেল আরো ক্ষেপে যায়।

আমার কাজিন (খালাতো বোন) দেখা হলেই বলে, কিরে পাজি আমার শাড়িটা ফেরত দিবি না?

আমি হাসি এবং বলি, পাস করেই আপনাকে শাড়ি কিনে দেবো। মনে মনে বলি,

*হে শাড়ি, তুমি আষ্টেপৃষ্টে জড়ালে বঙ্গ ললনারে*
*মাঝে মাঝে পুরুষ তোমার প্যাচে সত্যিই জড়িয়ে পড়ে।*

*সিলেট থেকে*

## ময়নামতি

– মীর ফসিয়ার রহমান

শাড়ির কথা উঠলেই আমার যেন *কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা* লাগে। যৌবনের গোড়ার দিকের সেই লজ্জাজনক ঘটনাটা আমাকে কষ্ট দেয়। আর্থিক অনটন কিভাবে আমার প্রেমের তাজমহল গুড়িয়ে দিল সেই কাহিনীই আজ শোনাবো এবং সে কাহিনী একটা শাড়িকে কেন্দ্র করে। শাড়িটার নাম আনোয়ারের *মালা শাড়ি।*

ছিয়াত্তর সাতাত্তর সালের ঘটনা। আমি তখন খুলনা সিটি কলেজের ছাত্র। সিনেমা দেখাও সবে শুরু। সোসাইটি হলের *ময়নামতি* ছবিটা তখন খুলনার তরুণ সমাজে ঝড় তুলেছে। সবাই যেন ব্যর্থ প্রেমিক, সবার মুখে একই গান, *অনেক সাধের ময়না আমার বাধন কেটে যায়।* যাক, আমার ময়না কিভাবে বাধন কাটলো সেটাই খুলে বলি।

আমার সে ময়নার নাম ছিল লাইলী। পাশের গ্রামেই বাড়ি। নিকলাপুর। সিনেমার ময়নার মতো করেই ধানক্ষেতের চড়ুই পাখি তাড়াতো। কাছে গিয়ে দাড়াতাম। দুই চারটে খাজুরে আলাপ হতো। সংযোগটা পাকাপোক্ত করতে আমার সামান্য বাজেটও ধার্য ছিল। তার মধ্যে বিনা পয়সার গোলাপ, বকুল আর খরচের ভেতর এক আনার চকলেট, দুই আনার বাদাম, চার আনার ফিতা উল্লেখযোগ্য। সে সময়টাতে চায়নিজ রেস্তোরা, জুয়েলারি, প্লট, ফ্ল্যাট এসব নাম লাইলী তো জানতোই না। আমিও না।

তখনকার দিকে আনোয়ারের মালা শাড়ি নামের এক ধরনের চোখ ধাধানো শাড়ি খুব বাজার পেয়েছিল। গ্রামের মহিলারা দেদারসে কেনা ও পরা শুরু করেছিল। একদিন লাইলীও কথার ফাকে মালা শাড়ি পরার শখটা প্রকাশ করলো। দাম তিনশ টাকা। মাথায় বজ্রপাত। বলাই বাহুল্য, শেষে লাইলীকে আর মালা শাড়ি কিনে দেয়া সম্ভব হয়নি। বেকারত্বের কঠিন শীতল স্পর্শে তখন আমার নাভিশ্বাস চলছে। বেশ কিছুদিন লাইলীর সঙ্গে দেখা করিনি লজ্জায়।

অবশেষে বেকারত্ব ঘুচলো। সারদায় চলে যাবো ট্রেনিংয়ে। তাই ভাবলাম আমার সাফল্য ওকে পুলকিত করবে। মালা শাড়ির কথা ভুলে যাবে। একদিন বিকেলে ওদের আঙ্গিনায় গিয়ে দাড়ালাম। লাইলীকে এক ঝলক দেখলাম। বুকের ভেতরটা খচ করে উঠলো। সে একখানা মালা শাড়ি পরে ঘোরাঘুরি করছে।

ভীষণ ব্যস্ত, আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হলো না। হায়রে সর্বনাশা মালা শাড়ি! হায়রে বেকারত্ব! হৃদয়ের গহীনে গড়ে ওঠা ভালোবাসার তাজমহলখানা ব্যর্থতার যমুনায় ভেঙে পড়ার ঝুপ ঝুপ শব্দ। অপমানের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। গায়ের মেঠোপথ ধরে হাটলাম এবং *ময়নামতি* ছবির গানের কলি আওড়ালাম *হায়রে টাকা, তুমি সময় মতো আইলা না।*

*খুলনা থেকে*

## আকাঙ্ক্ষা

– মাসুদুর রহমান রানা

অভাব মানুষকে কতোটা দুঃসহ পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে তা যারা অভাবে না পড়বে তারা কখনো বুঝবে না।

ভাইয়া, আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিবি? এ প্রশ্ন করেছিল আমার ছোট বোন ক্লাস টেনের ছাত্রী ইতি। আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা খুব একটা ভালো ছিল না। প্রথমে বাবাকে আমার বোন ইতি বলেছিল শাড়ির কথা।

বাবা বলেছিলেন, আর কয়েকটা দিন দেরি করো মা। বেতন পেয়ে কিনে দেবো।

বাবা এভাবে দীর্ঘ দিন ওকে আশা দিয়েও কিনে দিতেন না। বেতন অবশ্য ঠিকই পেতেন। কারণ বাবা ছিলেন সামান্য বেতনের একজন চাকরিজীবী। তাই *নুন আনতে পান্তা ফুরোয়* অবস্থা।

সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। ঢাকাতে অতি কষ্টে চলতাম। একদিন বাড়ি গিয়েছি। বোন ইতি আমার কাছে খুব আশা নিয়ে বলেছিল, ভাইয়া, আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিবি?

কিন্তু সে সময় আমি আমার বোনের আবদার পূরণ করতে পারিনি। আমি চলবো কিভাবে সে কথা ভাবতেই তখন হিমশিম খেয়ে শাড়ি কিনে দিতে পারেননি। তাই ওকে আশা দিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল। তারপরও ওকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে, ঢাকা গিয়ে তোর জন্য শাড়ি কিনে পাঠাবো। তুই কয়েকটা দিন দেরি কর। এই আশা দিয়ে ওকে শান্ত করি।

কিন্তু কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও ওকে শাড়ি কিনে দিতে পারিনি। কারণ টিউশনি করে যা পাই তা দিয়ে আমারই চলে না।

শাড়ির জন্য বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারি না। বাবা, মা, বোন সবাই চিঠি লিখে বাড়ি যেতে বলে। কিন্তু আমি আসছি আসছি বলে তাদের অপেক্ষায় রাখি।

সামনে ঈদ। এবার আর বাড়ি না গিয়ে উপায় নেই। তাই টিউশনির টাকা কিছু জমিয়ে এবং বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে সাতশ টাকা দিয়ে গাউছিয়া মার্কেট থেকে একটা শাড়ি কিনি। শাড়ি কিনে মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডে এক আত্মীয়ের বাসায় যাই।

ওই বাসায় খাওয়া–দাওয়া শেষ করে করে ভাবলাম, হেটে কলেজ গেট পর্যন্ত চলে যাই। হেটে যাচ্ছিল জেনিভা ক্যাম্পের কাছাকাছি যেতেই একটা ছেলে নেশাগ্রস্ত মনে হলো, আমাকে ডেকে বলে, এই যে ভাই, শোনেন।

কাছে গেলাম।

যাওয়ার পর বলে, *আপনি ওই পোলারে কি কইছেন!* বললাম কোন ছেলের কথা বলছেন? লোকটি বললো, ওই যে দাড়িয়ে আছে। এই কথা বলে আমাকে একটা বন্ধ দোকানের পাশে নিয়ে গেল। তারপর দুই তিনজন ছেলে এসে বললো, যা আছে বাইর কর তাড়াতাড়ি।

বললাম, ভাই, আমার কাছে শুধু আমার বোনের শাড়িটা আছে। এটা নেবেন না।

তখন একটা ছেলে দেখি চাকু বের করলো। আরেকজন আমার হাত থেকে টান মেরে শাড়িটা নিয়ে গলির মধ্যে চলে গেল। তারপর পকেটে দুইশ–র মতো টাকা ছিল, তাও নিয়ে নিল।

অনুরোধ করে বললাম, ভাই, হলে যাবো। ভাড়ার জন্য কিছু টাকা আমাকে দেন।

দিল না একটা টাকাও। আরো বললো, *সিনেমা দেহা লাগবো না। বাড়ি যাওগা।*

বললাম, সিনেমা হল না, ইউনিভার্সিটির হল যেখানে ছাত্ররা থাকে।

ওরা বললো, *হাইট্টা যাওগা।*

নিরাশ হয়ে হাটছি আর ভাবছি এখন কি করবো? ঈদের আর মাত্র চার দিন বাকি। একবার ভাবলাম, তাজমহল রোডে ওই আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে সব বলি। তারপর নিজের কাছে খারাপ লাগলো বলে গেলাম না। হেটেই হলে ফিরলাম। ফিরে বন্ধুদের সব ঘটনা বললাম। ওরা সান্ত্বনা দিল। কেননা ওরা সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া কিইবা করতে পারে? ওরা তো আমার মতোই। এরপরেও কয়েকজনে টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি নিইনি। পরদিন বাড়ি চলে গেলাম।

ইতি আমাকে দেখেই উল্লাসে উঠলো, ভাইয়া এসেছিস? আমার বোন আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, ভাইয়া, আমার জন্য শাড়ি এনেছিস?

নিশ্চুপ হয়ে থাকি। আবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি। বললাম, না বোন, আনিনি। সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম।

তারপর ইতি বললো, তোর বানানো গল্প রাখ। তোর কথা বিশ্বাস করি না। এ কথা বলতেই তার চোখ দিয়ে অমনি পানি চলে এলো।

বললাম, তোকে কয়েকদিনের মধ্যে শাড়ি কিনে দেবো।

এতো করে বোঝালাম তবুও বুঝলো না। এমনকি বেশ কয়েকদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি ইতি। তারপর কোরবানি ঈদে ওকে শাড়ি কিনে দিই। তখন তার আনন্দ দেখে কে। এখন আমার বোন বিবাহিতা। স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকে। সচরাচর দেখা হয় না। এরপরও দেশে এলে প্রথম জীবনের কথা মনে করে সাত আটটা শাড়ি কিনে দিই। যদিও তার অঢেল শাড়ি রয়েছে তবুও।

*ইসলামপুর, ঢাকা থেকে*

## মিলন হবে কতো দিনে

– চঞ্চল শাহরিয়ার

সবুজ শাড়ি পরা দীপাকে দেখলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আকাশি রঙের শাড়ি পরা রোজীআপাকে দেখলেই চোখে ঘোর লেগে যায়। হলুদ শাড়ি পরা সিমিকে দেখলেই চুমু খেতে ইচ্ছা করে।

বিনা পয়সায় বেধড়ক ওষুধ খাওয়ার ভয়ে আমার এ অদম্য অনুভূতির কথা কাউকেই সরাসরি বলিনি। কিন্তু সত্যি এ তিন মেয়ে এই তিন রঙা শাড়ি পরে সামনে এলে আমার সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাদারাম হয়ে যাই। মাত্র এমএ পাস করে বের হয়েছি। এখনো চাকরি পাইনি। ফুল টাইম বেকার। মা, বোন, ভাবীদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দিন চলে। দিন চলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো আর চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে। একান্ত সঙ্গী নচিকেতার জীবনমুখী বাংলা গান। এই যখন অবস্থা তখন কি করে সবুজ, আকাশি আর হলুদ রঙা শাড়ি পরা মেয়ে তিনটিকে মনের কথা বলি? মনের কথা বললেই আমাকে হাদারাম পেয়ে তারা নাচানো শুরু করবে। তারা দেখতে সুন্দরী হলে কি হবে, তারা যে জিনিস তাতে মনকে বাগ মানাতে পারি না। বেইলি রোডের শাড়ির দোকানগুলো দেখলে আমার মন আনচান করে। দোকানে টাঙানো সবুজ শাড়ি দেখি। আমার দীপাকে মনে পড়ে যায়। আকাশি রঙের শাড়ি দেখি রোজীআপাকে মনে পড়ে যায়। হলুদ শাড়ি দেখি আমার মন জুড়ে সিমি, সিমি আর সিমি।

শেষমেষ কল্পনায় তিনজনের সঙ্গেই পৃথকভাবে কথা বলি। সবুজ, আকাশি আর হলুদ শাড়ি পরা তিনজনকেই সমান প্রশংসা করি। বলি, তুমি খুব সুন্দর। এই শাড়িতে তুমি আরো বেশি সুন্দর। ইচ্ছা হয় পৃথিবীর সব শাড়ি তোমাকে কিনে দিই।

তারা আনন্দে আত্মহারা হয়। শাড়ির আচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করে। আনন্দে বার বার নিজের গালে নিজেই হাত বোলাই।

বাস্তব ভিন্ন। দীপা সবুজ শাড়ি পরে কলেজের মেধাবী ছাত্রটির সঙ্গে ট্রেন লাইনে হেটে বেড়ায়। আকাশি রঙের শাড়ি পরে রোজীআপা তার একমাত্র ছেলে মাহিনকে স্কুলে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। স্বামীর জন্য প্রহর গোনে। সিমি হলুদ শাড়ি পরে বান্ধবীদের সঙ্গে বিয়ে, জন্মদিন, পিকনিক, কলেজের নবীনবরণ, পহেলা বৈশাখ উদযাপন নিয়ে ব্যস্ত। সিমি ফাকা আছে মনে করে সিমিকে দিয়ে ট্রাই করলাম। তাকে সাহস করে বললাম, তোকে হলুদ শাড়ি পরে বেশ...।

উত্তরে সিমি বললো, শুনে খুশি হলাম। তবে আরো খুশি হবো বিকেলে তোদের বাসার ছাদে মোহনভাইয়াকে যদি ডেকে আনতে পারিস।

*কোটচাদপুর, ঝিনাইদহ থেকে*